শারদীয়া

সোঁদামাটি

দশম বর্ষ ।। আশ্বিন ১৪৩০

সম্পাদক : দীননাথ মণ্ডল

দশম বর্ষ
■
শারদ সংখ্যা
■
আশ্বিন ১৪৩০

সাহিত্য পত্রিকা

Sondamati
A Literary Magazine
October 2023

সম্পাদক
দীননাথ মণ্ডল

প্রচ্ছদ
অনুষ্কা দাস

সম্পাদকীয় দপ্তর
গ্রাম ও ডাক : মির্জাপুর
থানা : বেলডাঙা
জেলা : মুর্শিদাবাদ
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
পিন : ৭৪২১৩৩

E.mail : sondamati@gmail.com
Mobile : +91 9153126613

ওয়েবসাইট
www.sondamati.blogspot.in
ফেসবুক
www.f.b.com/sondamati

বিনিময় মূল্য : ৬০ টাকা

সূচিপত্র

কবিতা

ছড়া

ছোটগল্প

প্রবন্ধ

রম্যরচনা

সম্পাদকীয়

বাতাসে শিউলি ফুলের সুগন্ধ। আকাশে সাদা মেঘ। সবুজ ঘাসের মাথায় পুঞ্জপুঞ্জ কাশ ফুল। দিঘির জলে শালুক পদ্ম। এসেছে শরৎকাল। প্রকৃতি আনন্দে মত্ত। করোনা'র প্রকোপ কাটিয়ে জনজীবনও স্বাভাবিক। মন্দিরে মন্দিরে দেবী দুর্গা মায়ের আগমনের প্রস্তুতি। বাঙালির হৃদয়েও উৎসবের আনন্দ। এই আনন্দে আলোকিত হোক বিশ্ব। আলোকিত হোক মানব হৃদয়। নব নব সৃষ্টির ফল্গুধারা প্রবাহিত হোক চেতনায়। দূর হোক অজ্ঞতা, সংকীর্ণতা, ভেদাভেদ, হিংসা-বিদ্বেষ। মানবতার ধ্বজা উড়ুক মননে। জয় হোক ভালোবাসা ও মনুষ্যত্বের। সমস্ত লেখক-লেখিকা ও শুভানুধ্যায়ীদের সহযোগিতা করার জন্য জানাই অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞা।

দীননাথ মণ্ডল

সোঁদামাটি'র শারদ সংখ্যা ১৪২৬, প্রকাশ অনুষ্ঠান ১০ অক্টোবর, ২০১৯

বড়ুয়া যুবক সংঘের কনফারেন্স রুম

স্মৃতি

রাজকুমার রায়চৌধুরী

ভাঙা ওই আকাশের ভেতর প্রকাশিত হচ্ছে প্রেমের বিদ্যুৎরেখা,
সামান্য হাওয়ায় ওড়ে ইস্কুলের দেবীর দুরন্ত সবুজ ডানার স্রোত
বাঁকের মুখে অপেক্ষার আকাশ জুড়ে ঘোরে দু'রঙা ঘুড়ির আকাশ,
লাফিয়ে ওঠে শাসনের বেত, কেশব নাগ বাঁধে অঙ্কে আমাদের।

পুরনো দিনের চঞ্চল সাদা হাসি উড়ছে আজও বাতাসের মধ্যে...
দূর থেকে চোখের ছোঁয়া, স্মৃতির কৌতূহল ভেঙে পড়ে নীরবে।
বৃষ্টির ফোঁটা আটকে রাখে মধ্যদুপুরে মায়াবী অভ্যাসে ক্লাসরুমে,
লাল নীল বৃষ্টি পড়ে, পাতা নড়ে, ঘুরছে মেঘ অসম্ভব বদমেজাজে
বুঝতে পারি ঠোঁট নামিয়ে কামড়ে ধরে নাইন ক্লাস এখন খুব জোরে।

পেরিয়ে যাব আকাশপাড়া ধারালো ডানায় গাছের মধ্যে সূর্য বেঁধে,
দাঁড়াব গান নিয়ে দু'হাতে, চিনতে পারবে ওগো ও বান্ধবী হাওয়া?
তোমার দু'গালে প্রেমের আদরে ফুটে ওঠে রহস্যময় চঞ্চল ব্রণটি,
সমস্ত রাগ খরচা হয়ে গেছে এবার বলো কেমন আছ দস্যি ঢেউ?
পারমিট নেব টেবিলের নীচে চোরাপথে, ঘুরব আজ পথে পথে
বলো তুমি রাজি! মাঝবয়েসে ভিজব আমরা সর্বগ্রাসী ক্ষুধার আগুনে।

ম্যাজিক

সন্তোষ রায়

সারাদিনের উৎসব শেষে ধীরে ধীরে সূর্য নামে ৫৬র ৩০ নাম্বার বুথের ব্যালট বাক্সে।
এটাই দিনের শেষ ভোট। অনেক তারকা দর্শনে নিরাপত্তা রক্ষীরা আজ সম্মোহিত,
উজ্জীবিত পোলিং স্টাফ, প্রার্থীরা নিজ নিজ কক্ষপথে ঘূর্ণায়মান।

সবারই ধারণা আগামীর ভোরে নতুন সূর্যোদয়।
বন্দুকের নল ঘেরা সূর্য গেছে স্ট্রংরুমে।
সপ্তাহান্তে সিল ভাঙা হলে টেবিলে গড়িয়ে পড়ে সব লাশ, বুকে কারো ছাপ নেই,
রক্তে তাপ নেই। কমিশন বলে, মৃত্যুর কারণ, অগণিত তারকার চাপ।

খসড়া

সুস্মেলী দত্ত

সমস্ত রাত ত্রিকোণ উঠেছে জেগে
সমস্ত দিন বৃত্তের সহবাস
যুগ মহামাস বছরের সমঝোতা
অথচ একাল উন্মাদ প্রতিভাস

দেখা হয়েছিল আস্টেপৃষ্ঠে ঠোঁট
জানলায় নখ বৃহন্নলার বেশ
ইরোটিক থেকে শাকাহারী সংযমে
সংক্ষেপে প্রেম বিষন্ন সংশ্লেষ

তুমি চেয়েছিলে সাপ নয় হিলহিলে
ডেকেছিলে কত নদীর আরেক নাম
আমার আকাশ নিঃস্ব ও গুঁড়ো গুঁড়ো
বিশেষ্য যোগ বিয়োগ সর্বনাম

সমস্ত মন ঝকমারি ইতিহাস
লিখেই চলেছি নিঃশ্বাস প্রশ্বাস।

একটা শহর যেমন থাকে

নির্ঝর চট্টোপাধ্যায়

একটা শহর যেমন থাকে, ঠিক তেমন
শহরের এক কোণে থাকে, বস্তি

শহরের উঁচু উঁচু অট্টালিকা কত স্বপ্ন উড়ে
স্বপ্ন ঘিরে দুঃখ কষ্ট হাসি কান্না

দূর থেকে যতটা ভাবি
ততটা সুখ কিন্তু নয়... কনক

ছোট্ট ছোট্ট ঘর, গায়ে গা ঘেঁষে কত স্বপ্ন
বস্তির অস্থি জুড়ে, অভাবের স্রোত
তবুও আনন্দ উল্লাসে কাটে জীবনযাত্রা

মানুষজন জীবজন্তু গাছপালা কত ঘনিষ্ঠ
সম্পর্ক থেকেও কখনো কখনো
উসকানিতে যুদ্ধের দামামা বাজে বইকি

তবুও অভাবের দুয়ারে একটা শান্তি আছে
আপদে-বিপদে সবাই ছুটে আসে ছুটে যায়
এইটাই জীবন, জানো কনক

দুঃসময়ের পদাবলী

নীহারুল ইসলাম

কাকে দেব দোষ, কার পাপে এই হাল
কে কী করতে চায়, কেন পেতেছে জাল?
কিছুই বুঝি না, তবু আছি সব কিছুতে—

আমারও স্বপ্ন আছে, তাই আছি পাত পেতে।

যদি কারো করুণার ছিঁটে পড়ে হাতে
যদি ডাল-ভাত পড়ে পাতে!
সেই সঙ্গো, ঘুমিয়ে একটু শান্তি চাই—

চড়াম শব্দে বাজ পড়ে, বন্ধু— শান্তি কোথায়?

কেউ খাওয়াচ্ছে গুড়-বাতাসা, কেউ বাজাচ্ছে ঢাক
নদীতে বইছে রক্তধারা বাতাসে ভাসছে আর্তনাদ!
কাকে দোষ দেব, এই হাল কার কোন পাপে—

চারিদিকে রক্ত দেখি, ভয়ে বুক কাঁপে।

গোপন কুয়াশা

অভিজিৎ রায়

লুকিয়ে কাঁদার ঠিকানা আমার
হারিয়ে ফেলেছি জেনে
অপরাধবোধ পাহাড়ি পথের
কুয়াশা দু'হাতে কেনে।

ঝাপসা আলোয় নিজেকে লুকিয়ে
ঘুমপাড়ানির গানে
মত্ত থাকার অভিনয় করি
কথা বলি কানে কানে।

পাতায় পাতায় ফিসফিস করে
গল্প করেছে যত
আমিও ততই লুকিয়ে কেঁদেছি
গোপন করেছি ক্ষত।

কুয়াশায় লেখা সেই সব ব্যথা
গান হয়ে ফিরে এলে
আগুন পোহাই আমি একা পথে
যন্ত্রণাগুলো জ্বেলে।

একটি প্রেমের চিঠি লিখতে বসে এরকম হল
তাপস রায়

আমার রং ও তুলির মাঝখানে এসে বসেছ, হিস হিস করছে হিংসা
আমাকে যেভাবে বাধ্য করছ হিংসা দেখতে সেভাবেই তো
দেখছে রং ও তুলি। তুমি জানো আমরা আলাদা আলাদা কিছুই করতে সক্ষম নই

নদী ও আমার পারস্পরিক বোঝাপড়ার ফলে এখানে এসেছে জনপদ
মাঝি-মাল্লার গান এসেছে, দুপুর দুপুর তোমার নজরে পড়তে পারে দল বেঁধে
ফড়িং উড়ছে মাটি ছেড়ে অল্প উঁচুতে, আজ আর বৃষ্টি হবে না ধরে নিলে
একটা ফেলে আসা ঘোর এসময় মনে পড়তে পারে,
মানে হাতে তেমন কাজ না থাকলে
যেরকম হয়, রোদ্দুরে মেঘ শুইয়ে দিয়ে ভালো করে সেঁকে তুলি কোনোদিন
আবার এরকম হয়েছে পুরানো চিঠির বান্ডিল এগিয়ে এসেছে এমন— নাড়াচাড়া করি
কিন্তু দেখেছ, যেকথা বলব বলে এত পায়তাড়া কষা, কেমন বেমালুম ভুলে গেছি

ভালোবাসার নরম বর্ষাতি
আবু রাইহান

হে লাবণ্যময়ী, তুমি তো রমণীয় গুণের সমাহার
তুমি যত না দিয়েছ শান্তি...

তার চেয়ে বেশি পেয়েছি হাহাকার
হায়! তবুও আমার অস্থির তনু
প্রিয় বৃষ্টির কাছে নতজানু
কামনার সিম্ফোনি বাজায় রাত্রির মধ্যযাম
আহত অশ্বের মতো অস্থির হয়ে আছি অবিরাম
স্বপ্নে, জাগরণে ঘন ঘোর এক দুর্যোগের আকাঙ্ক্ষায়
প্রবল বর্ষণের রাতে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছি
ব্যর্থ বিপ্লবী আমি তোমার দরোজায়
সাথে নেই কোনো বৃষ্টি আড়াল করার ছাতি
তোমার কাছেই যখন রয়েছে ভালোবাসার নরম বর্ষাতি।

সাদা কালো বাবার প্রজাপতি মেয়ে

দেবাশিস সাহা

মেয়েটির বাবা
সারাদিনের সংগ্রহ করা দুঃখ
পুড়িয়ে দেয়

ছাই ঘেঁটে
মেয়েটি ঘরে আনে
বাবা রঙের অনেক ভালোবাসা

ছাই থেকেই তৈরি হয় সার
গাছ ভরে ফুল ফোটে
মেয়েটি তখন সদ্য প্রজাপতি

সাদা কালো বাবার থেকে
উড়ান শেখা মেয়েটি
প্রজাপতি হয়ে চলে যায়
অন্য বাবাকে আরো সবুজ ও সুন্দর করতে...

অঙ্কবিন্দু

আদ্যনাথ ঘোষ

অঙ্কের বিন্দুর মতোই অস্তিত্ব নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে আমাদের বিভ্রান্ত বিকেল। সে এখন পুরাঘটিত অতীত। হয়তো ঘটমান বর্তমানের কাছে বার বার চেষ্টা করেও আসা হয়নি তার।
কেনো না আজন্ম অন্ধের কাছেই পরাজয় স্থির থাকে।
গিলে খায় তিতিক্ষার আদিগন্ত দেহ
বিন্দু বিন্দু রক্ত ঝরে পৃথিবীর শস্যক্ষেত্র থেকে - জলের জন্ম কীভাবে হয়, জানা হয়নি তার।
জেনেই বা কী করার আছে? দ্যাখো দূরের বাতাস কি সন্ধ্যা নামায় আমাদের অঙ্কের বিন্দুর মতোই জীবন্ত খোলসে।

কাল সময়

শামীমা শ্রাবণী

ভাঁজ করা হাতের উপর থুতনি রেখে বসে আছে দুঃখী বিকেলের অবয়ব...
আঁচলের গিঁট খুলে,
প্রজাপতির মতো উড়ছে তার বিগত দিনের শৈশব,
আর পাখনার সব রং শুষে—
রুদ্ধশ্বাসে দৌড়াচ্ছে কাল সময়ের দুরন্ত সহিস।

বৌ'ঝির পোয়াতি মাঠ জুড়ে আজ শুধুই অপ্রসূত আনন্দের ব্যর্থ চিৎকার!

বিবর্তনের হাত ধরে,
উন্মাতাল তালে নাচছে আজ আনাড়ি পায়ের নূপুর,

রুক্ষ সময়ের ক্ষুধা গিলে খাচ্ছে—
অবিশ্বাস্যে জীবনের ব্যাকরণ না জানা অনুর্বর সুর!

অবাধ্য স্রোতের হুংকারে ভাঙ্গাছে কাদা-জলে গড়া
পুতুলের ভাঙা নরম বুক।

নিস্প্রাণ হাসি পড়ে আছে, রাখালের ভাঙা বাঁশির ঠোঁটে
এইসব দেখে আজ শুধু বিকেলের দুই চোখ ভিজে ওঠে..

বিপন্নতা

অরুণ ভট্টাচার্য

আলোর তীব্রতায় বিপন্ন বোধ করি এখন
মনে হয় আমার পৃথিবীটা পরিতক্ত পাত কুয়ো,
বিশ্বাস ভেঙেচুরে
সুখ থালাটা দোল খেতে খেতে চলে গেছে গভীরে
এই অন্ধকারে মিশে থাকা বিষের তীব্রতায়
ছটফট করছে শরীর।

ছবিটি কেউ পোস্ট করেছে সোশ্যাল মিডিয়ায়
লাইক আসছে হাজার হাজার

কোন সেই প্রশ্নের মুখোমুখি আজ
এ যন্ত্রণা জীবনের না মৃত্যুর
নাকি সময়ের আধুনিক সাজ!

হেঁটে যাই নক্ষত্র পথে

আব্দুল বারী

দাম্পত্য সুখ নাকি দুঃখরা বালি উড়ায়
যত পথ হাঁটি ছায়া ঘোরে পায়ে পায়ে
মুখ ভেংচায়—
আলোহীন আঁধারে উঠোনের সীমানায়
মালতি চম্পা শিশির স্নানে শিয়ালের ডাক শোনে।

আমি শুধু সাদা ফ্লাগ কাঁধে তুলে
দুঃখের সাথে হেঁটে যাই নক্ষত্র পথে।

বিশ্বাস

গালিব হিকমাত

প্রচণ্ড খরা
পৃথিবী বুক চিরে চৌচির হয়ে আছে
সবুজ পাতারা খসে পড়ছে
মর্মর শব্দে;
সবাই ভাবল বৃষ্টি হবে
একটু ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা যাক

বিশ্বাস করুন —
সেদিন লক্ষ মানুষ প্রার্থনার জন্য সমবেত হল
ফুটিফাটা মাটির তল্লাট জুড়ে
কেউ টুপি পরে
কেউ গেরুয়া নামাবলী গায়ে
কেউ যপের মালা গলায় ঝুলিয়ে
কারো হাতে তসবিহ

আর প্রহর শেষে
একটি মাত্র ছেলে এল ছাতা হাতে
বৃষ্টি নামল।

জীবন

নাজমিরা সুলতানা সুমি

হাসি আমার জীবন, কান্না আমার সাথি,
চলার পথে দু'জনকে কেমনে আমি ছাড়ি?
দেহ আমার বস্ত্র, মনটা আমার শুভ্রপত্র।
এই মনেরই শুভ্রপত্রে লিখে আমার কাহিনী।
বস্ত্র আমার যেমনই হোক, সেটাই আমার বাহিনী।
সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না নিয়েই তো জীবন আমাদের।
জীবনের আবার মানে কি সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না বাদ দিয়ে দিলে।

চাবুক
মীর আজিজুর রহমান

আমাদের জীবন, মুমূর্ষু মন,
স্বপ্ন বলতে একমুঠো ভাত আর নিরাপদ আশ্রয়;
সব তুলে দিয়েছি তোমাদের হাতে।

টুকরো টুকরো শক্তিগুলো,
আজ আপনাদের হাতের মুঠোয়

লাউড স্পিকারের সেই শব্দ—
বন্ধুগণ! আপনারা আমাদের সেই বিজয় পতাকা।
বড় আশ্চর্য!
আজ আমরা অশ্বের বেগে ছুটি
আমাদের শক্তি, আজ আমাদের পিঠেই
চাবুক হয়ে পড়ে...

সাম্প্রতিক এইসব ভাবনা থেকে
সুশান্ত বিশ্বাস

দয়া সইতে সইতে
হাতগুলো পাত্র হয়ে গেছে।
বিশ্বাসগুলো অনশনরত শুয়ে আছে কতদিন,
খিল খিল করে হাসতে হাসতে চলে যাচ্ছে রাস্তা—
ঠিকানা জানেনা ডাকপিওন।

চোখগুলো নদী হয়ে ঝরে পড়ছে
বৃষ্টির অদ্ভূত শব্দেরা ঢেকে ফেলছে তার ছায়া।
ছাতা মাথায় হু-হু ছুটে যাচ্ছে এক ঝাঁক মার্সিডিজ,
কাদার মধ্যে লেপটে থাকা গরুর গাড়ির চাকার মতোই
পৃথিবীটা ঘুরছে, বৃদ্ধ কিষাণ প্রাণপণ ঠেলছে—

সময়ের প্রেম

মোজাম্মেল সেখ

আকাশে-বাতাসে মুখরিত
হরেক প্রেম-কথা
শব্দের জাল বুনতেই —
সব কেমন এলোমেলো...
শিরি পাট ক্ষেতে — নগ্ন দেহ
ফারহাদ 'লাভ জিহাদে' জেলে
বিরহিণী রাধার — চোখের জল
যেন ভাদুরে আমনের শিশির বিন্দু
ঘরে ঘরে কালের কেস্টরা রোপন করে
গোপন — প্রেম বীজ!

আমাদের মত সম্পন্ন ঘরে
কোন ভনিতা ছাড়াই বেজে ওঠে
বিয়ের সানাই —
অন্ধকারে কান পাতলেই অবৈধ
ফিসফিসানি
রাজপথে নগ্ন নারীদের প্যারেড!
ফেটে পড়তে ইচ্ছা করে তীব্র রাগে
'চার দেওয়ালে' অথবা 'মুখ বইয়ে'!
অথচ ভালোবাসা নৈব নৈব চ!

বিচ্ছেদ

দেবপ্রসাদ সরকার

বিচ্ছেদের ভয়, বেদনার ভয়
এক সময় ছিল এ সব,
ছিল যখন মানব হৃদয়;
এখন বিচ্ছেদ বেদনার সে ভয় কোথায়,
বিচ্ছেদই আনন্দ এখন, বিচ্ছদেই জয়!

ছড়া

শ্যামল বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছড়া

(১)
চাতক চাতক চাতক রে
ডাকিস ফটিক জল
কোথায় গেলে পাব তোরে
বলনা রে ভাই বল।

(২)
গাংশালিক রে গাংশালিক
আছিস ক্যামোন ভাই?
আজকের শিশুর মনে
তোদের কোন ছবি নাই।

(৩)
কাকাতুয়া কাকাতুয়া
আমার সঙ্গো যাবি?
একটা গান শোনাস যদি
বাটি ভর্ত্তি পানতোয়া পাবি।

(৪)
চন্দনা রে চন্দনা
দেখতে তোরে মন্দ না
সন্ধ্যে সকাল গেয়েই চলিস
কোন মহানের বন্দনা।

(৫)
সড়ক নামের পাখি আছে
কয়টা শিশু জানে?
ঘর সংসার সন্ধ্যে সকাল
ভরে থাকে, তাদের কলতানে।

খেলব না আর

নুরুল ইসলাম মিয়া

মাগো! আমি খেলব না আর
যাব না আর মাঠে
বলের মতো কী সব জিনিস
থাকছে পথে-ঘাটে।

শুনেছ কি? ওই যে গাঁয়ের ওই ছেলেটা
কী নাম যেন তার
খেলছিল সে একাই মাঠে
ছুটছিল বারবার।

বলের মতো কী জানি কী
ছিল সেথায় পড়ে
বল ভেবে সে মারল লাথি
একটু খানিক জোরে।

যেই না মারা, ঝলসে গেল
উঠল আগুন জ্বলে
সে নাকি আর ফিরবে না মা
নিজের মায়ের কোলে।

বলো মাগো!
আর কোনোদিন জাগবে না সে
ডাকবে না মা বলে?
কখনো কি খেলবে না আর
বিকেল বেলা হলে?

বলছে লোকে এসব নাকি
জীবন নিয়ে খেলা
তাই তো আমি আর যাব না
খেলতে বিকেল বেলা।

দামাল বন্ধুদের জন্য হ্যাংলামোদের গান

আব্দুর রউফ

টোপা টোপা কুলগুলো একা একা খাচ্ছিস!
আমাকে না দিয়ে তুই কি সুখটা পাচ্ছিস?
তোকে দিই কত কিছু সেকথা কি মনে নেই?
চানাচুর বিস্কুট ভাগ নিস্ সবেতেই।
সেদিন তো আনলাম লুকিয়ে আচারটা
ধরা পড়ে মা'র কাছে খেলুম যে বকাটা।
তারপরও তুই আমি একসাথে চলা যায়?
কোন বাগে কি পেকেছে প্রাণ খুলে বলা যায়!

আরে আরে থাম্ থাম্ চটছিস কেন তুই
রেখেছি তোর লেগে সেরা কুল গোটা দুই।
কুল দিয়ে ছোড়দি বলেছিল— শোন ভাই
কুলগুলো একা খাবি কাউকে এ দিতে নাই।
করিসনা মুখ ভার এই নে দুটো কুল
হরলিকস আনব করব না আর ভুল।
আয় চল ছিপ নিয়ে যাব মাছ ধরতে
সাঁঝবেলা একসাথে বসব যে পড়তে।

মালদহের আম

মহঃ মতিউর রহমান

মালদহের আম
জগৎ জোড়া নাম।
ল্যাংড়া হিমসাগর
পাড়ি দেয় সাত সাগর।
ইংল্যান্ডের রানি
সেলাম করেন জানি।
বোম্বাই কোহিতুর
যায় যে বহুদূর।
আরব দেশের রাজা
পছন্দ করেন তাজা।

ব্যাঙ-চ্যাঙ

বলরাম হালদার

বৃষ্টি হয় নি বলে ঘ্যাঙর ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ
ডাকছিল দুটো লম্বাটে সোনা ব্যাঙ।
হঠাৎ মেঘ ডাকল গুড় গুড় গুড়ুম
বাজ পড়ল ওই দুড় দুড় দুড়ুম।
ইট ছুড়ল খোকন থামাতে ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ
লাফ দিতে গিয়ে ভাঙল ব্যাঙের ঠ্যাঙ।
দাদুর বড়শিতে বিঁধল ব্যাঙের ঠ্যাঙ
অবাক সব্বাই চ্যাঙ কি করে হয়ে গেল ব্যাঙ।

সকল দেশের সেরা

গার্গী মুখার্জী

যা চাইবে তাই পাওয়া যায়
সেই সে আজব দেশে,
রামধনু রং আকাশ থেকে
সাগর জলে মেশে।
হাত পাতলেই খাবার আসে
যা কিছু চাও মনে
চোখ খুললেই দেখবে সে সব
যা দেখেছ সপনে।
পাখির সুরে সুর মিলিয়ে
গাইবে সুখে গান
কান্না হাসি সব মিলিয়ে
জুড়িয়ে যাবে প্রাণ।
বাতাস ভরা ফুলের সুবাস
ভ্রমর ভরা ফুল
শান্তি সুখে ছোট্ট শিশু
দুলছে দোদুল দুল।
সবাই রাজার সেই সে দেশে
নাই কোন অপরাধ
হিংসা বিবাদ সকল কিছুই
দিয়েছে সে দেশ বাদ।
আমার দেশও এমনি হোক
মনে বড় আশা,
শান্তি সুখে থাকব সেথা
বাঁধব প্রেমের বাসা।
দেশের সেরা সে দেশখানি
স্বপ্ন দিয়ে ঘেরা
ভারতবর্ষ আমার সে দেশ
সকল দেশের সেরা।

বই পড়ো

সন্দীপ চট্টরাজ

রাত দিন সাত পাঁচ ভাবা তার কাজ
ভাবে কেন বিনা মেঘে পড়ে নাকো বাজ।
পৃথিবীটা কেন জোরে বন বন ঘোরে
তবুও আমরা কেন যাচ্ছি না প'ড়ে।
ফুল কেন ভুল করে ফোটে বেশি রাতে
বৃষ্টিরা গোল হয় কোন অজুহাতে।
চড়কা বুড়িটা কেন বসে থাকে চাঁদে
হারিয়ে বা যায় কেন কিছুদিন বাদে।
পিঁপড়ের দল কেন ঠোকাঠুকি খায়
শীত এলে কেন সব পাতা ঝরে যায়।
বাবা কেন রেগে গেলে বকে খুব জোরে
তখনই দু'চোখ কেন জলে যায় ভ'রে।
খুব তাড়াতাড়ি কেন হচ্ছি না বড়ো
সবাই বলছে আরো আরো বই পড়ো।
বই পড়ে বড় হও করো অনুভব
বই নাকি চুপিচুপি বলে দেবে সব।

ছোটগল্প

শোধ

গৌতম বিশ্বাস

সন্ধেবেলার আঁধারটা একটু একটু করে গাঢ় হতে শুরু করলে শশধরও কেমন পাল্টে যেতে থাকে। মাথার ভেতরে সবকিছু কেমন জট পাকিয়ে আসে তার। সেই জট ছাড়ানোর আপ্রাণ চেষ্টা করতে করতে যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ে তখনই ঘর থেকে বেরিয়ে আসে সে। আজও সে এমন করেই বেরিয়ে এসেছে।

ঘর বলতে খালপাড়ের ঈষৎ উঁচু জায়গাটায় কাঠা পাঁচেক ভিটের ওপরে জং ধরা ঢেউটিনের ছাউনি দেওয়া ছোট্ট একখানি কুঁড়ে। বেড়ায় পাটকাঠির ঘের। বাঁশের খুঁটি। দীর্ঘদিন না পাল্টানোর কারণে খুঁটি, বেড়া— উঁইপোকায় খেয়ে দিয়েছে অনেকটাই। বাকিটুকু বড়জোর বছর খানেকের অপেক্ষা। তারপরেই—

ঘরের সামনে ফালি উঠোন। একদিন এই উঠোনখানি বেশ ঝকঝকে তকতকে ছিল। উঠোনের পাশে ছিল তুলসির গাছ। উঁচু মাটির বেদী। নিত্য সন্ধ্যায় সেখানে প্রদীপ জ্বলত। ধূপের ধোঁয়া, ধুনোর গন্ধে ভরে যেত চারিদিক। কিন্তু এখন? সেই উঠোন জুড়ে কেবল ঘাস আগাছার দখল। তুলসির গাছটাও কবে মরে গেছে। মাটির সে বেদীটাও আর নেই। আর নিত্য সন্ধ্যায় যে মানুষটা প্রদীপ জ্বালত, শাঁখ-উলুর আওয়াজ করত, দুইবেলা ঝাট দিয়ে ঝকঝকে রাখত উঠোনটা- সে তো কবেই—

সরলা যেদিন নিশ্চিন্দিপুরের অমল গুছাইতের ছেলে নব'র হাত ধরে শশধরের সংসার থেকে বেরিয়ে গেল সেদিন থেকেই সবকিছু কেমন পাল্টে গেল বাড়ির। পাল্টে গেল শশধরও। দিনমানে তবু কাজকর্ম এটা ওটা নিয়ে থাকতে থাকতে ভালোই থাকে সে। কিন্তু সন্ধে নামতেই তার ভেতরে কি একটা যেন হয়। মাথাটা কেমন এলোমেলো হয়ে যায় তার। কিছু ভাবতে গেলেই কোথায় একটা তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করে। ঘরের ভেতরে দম আটকে আসতে চায়। আর এমনটা হলেই দরজার ঝাপ খুলে বেরিয়ে আসে শশধর। তারপর উঠোন পেরিয়ে হাঁটতে থাকে। কোনওদিন খালপাড় দিয়ে হেঁটে বেড়ায় কোনওদিন গাঁয়ের অন্য কোনও পথ দিয়ে। আর হাঁটতে হাঁটতে সে আকাশ দ্যাখে। আকাশের চাঁদ, তারা দ্যাখে। রাতের আঁধার দ্যাখে। আঁধার ঘেরা ঝোপঝাড় দ্যাখে। খালের জল দ্যাখে। জলের ওপর আকাশের ছায়া দ্যাখে। আরও যে কত কি দ্যাখে। আর এসব দ্যাখার পাশাপাশি শুনতেও পায় কতকিছু। ঝিঁঝি, ব্যাঙের ডাক। রাতজাগা পাখির কথা। গাছের

পাতা নড়ে ওঠার শব্দ। আবার শেয়াল, ইঁদুর, বনবেড়ালের ছুটে যাওয়ার আওয়াজও শোনে। এইসব শোনা আর দেখার জন্যে চোখের পাশাপাশি কান দু'টোকেও সজাগ রাখে সারাক্ষণ। ঘুমটুম আসেই না তাই বলতে গেলে। তাতে অবশ্য অসুবিধে হয় না তার। বরং বেশ ভালোই লাগে। আর আরও একটু ভালোলাগার জন্যে ভেতরটা আকুল হয়।

এই আজকেও ঠিক তেমনটাই হয়েছিল শশধরের। সন্ধে উতরে রাত নামলেও প্রথমটা সে অবশ্য বসে ছিল ঘরের দাওয়ায়। কিই বা এমন ঘর তার। ভাঙাচোরা একখানি কুঁড়ে। মাথার ওপর জং ধরা ঢেউটিনের চাল। চলটা ওঠা মাটির মেঝে। সেই ঘরের দাওয়াতেই বসে ছিল শশধর। পিঠটাকে বাঁশের খুঁটিতে এলিয়ে দিয়ে একমনে তাকিয়ে ছিল উঠোনের ওপাশে হাত তিনেক লম্বা হয়ে ওঠা ডুমুর চারাটার দিকে। একদিন ওখানেই ঝাটালো একটা রামতুলসির গাছ ছিল। গাছের গোড়ায় ছিল ছোট্ট একটা মাটির বেদী। সন্ধেবেলায় ওখানেই প্রদীপ জ্বালত সরলা। শাঁখ বাজাত। উলু দিত। তাকিয়ে থাকতে থাকতে সেই কবেকার দৃশ্যটাই যেন আরও একবার ভেসে উঠেছিল চোখে। আর অমনি কেমন অস্থির হয়ে উঠেছিল ভেতরটা।

না, আর বসে থাকতে পারেনি শশধর। মনখারাপিটা বেড়ে যাওয়ার আগেই বেরিয়ে পড়েছিল সে। দাওয়া থেকে নেমে উঠোন, তারপর উঠোনটা পেরিয়ে হাঁটতে শুরু করেছিল খালপাড়ের গা ঘেঁষে শুয়ে থাকা সরু রাস্তা দিয়ে। এখনও সে ওই রাস্তাটা দিয়েই হাঁটছে। খানিক আগে অবশ্য হরিমন্দিরের সামনের বড়ো শিরীষ চটকার গাছের নীচে যে বাঁশের চটা দিয়ে বানানো মাচা, তাতেই বসে ছিল শশধর। হাঁটতে হাঁটতে এমনি করে হঠাৎ হঠাৎ থেমেও যায় সে। হয়তো কোথাও বসে থাকে। কোথাও আবার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পার করে দেয় অনেকটা সময়। তারপর ইচ্ছে হলে ফের হাঁটতে থাকে।

আজও তেমনি বসে ছিল। বসে বসে আকাশ দেখছিল। না, আকাশ খুব একটা ভালো সে দেখতে পায়নি। সে দেখছিল মাথার ওপর আড়াল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা শিরীষ চটকার ডাল, পাতা। অল্প একটু ছেঁড়া ফাটা আকাশের উঁকি। পূবের আকাশে উঠে আসা আধখানা চাঁদ। চাঁদের গা থেকে গড়িয়ে নামা আলো। সেই আলো আবার কেমন করে গুলে যাচ্ছিল খালের জলে- তাও দেখছিল। দেখতে ভালোই লাগছিল। তারপর একসময় ভালোলাগাটা ফিঁকে হয়ে আসতেই ফের উঠে পড়েছে।

এখন আষাঢ়ের মাঝামাঝি। তবে এতটুকু মেঘ নেই আকাশে। আর নেই এতটুকু বৃষ্টিও। খালের তলানিতে সামান্যই জল। সে জলে মাছ অল্প বিস্তর আছে বটে তবে তার চেয়ে সংখ্যাটা বেশি সাপ, ব্যাঙ, জলপোকাদের।

হাঁটতে হাঁটতে একবার মনে হল খালে নেমে গা টা ধুয়ে নেয় খানিক। যা গরম পড়েছে আজ। ধুলে গায়ের সাথে সাথে মাথাটাও হয়তো ঈষৎ ঠান্ডা হত।

ভাবতে গিয়েই ফের দাঁড়িয়ে পড়ল শশধর। এখন শশধরের মাথার ওপরে বড়ে একখানি আকাশ। জায়গাটায় বড়ো কোনও গাছ নেই বলে আকাশ এখানে ওল্টানো কড়াইয়ের মত লাগছে। এমন খোলামেলা আকাশ দেখতে বেশ লাগে শশধরের। মনে হয়, 'এট্টাবার যদি ওখেনে পক্ষীর মতন উড়াল দিতি পারতাম।' আর মনে হলেই সে দু'দিকে দু'হাত প্রসারিত করে পাখির মত উড়াল দেওয়ার ভান করে। দিনের বেলা এমন হলে তা দেখে কেউ কেউ বলে, "তুই দেহি পক্ষী হইয়ে গেলি রে শশা।"

শশধর হাসে। বলে, "হ, আমি পক্ষী হইচি। বক পক্ষী।"

"তাহলি এখেনে ক্যান? খালে যা। বিলি যা।"

"যাবো তো। ইচ্ছে হলিই যাবো।"

বলতে বলতে ফের দু'হাত দু'দিকে ছড়িয়ে ওড়ার ভান করে শশধর।

এখনও তেমনই করল। সেইসাথে লাফও দিল গোটা তিনেক। তাতে হাত খানেকের বেশি উঠতে পারল না মোটেই। ফের একবার চেষ্টা করবে বলে লাফ দিতে গেল। কিন্তু পারল না। তার আগেই থেমে যেতে হল তাকে।

রাস্তার পাশে ভুবনের শোওয়ার ঘর। ওপরে টিন। নীচে মুলিবাঁশের বেড়া। ভুবন কাজ করে বাইরে। কেরালা না কোথায়। নয় মাসে ছয় মাসে একবার বাড়ি আসে। দিন কতক কাটিয়ে ফের চলে যায়। ছেলেপুলে হয়নি ভুবনের। বৌ একাই থাকে বাড়িতে। তাহলে?

দু'পা হেঁটে বেড়ার গাঁয়ে কান পাতল শশধর। ফিসফাস শোনা কথাগুলো স্পষ্ট হয়ে এল অমনি। নব'র গলাটা ঠিকঠাকই চিনতে পারল সে। 'কিন্তুক নব ক্যান এ বাড়িত্? এত রাইতে ভুবনার বৌর কাছে কি দরকার ওর?'

প্রশ্নটা মাথার মধ্যে উঁকি দিয়ে যেতেই শিকারি বেড়ালের মত পায়ে পায়ে হেঁটে পেছন দিক দিয়ে ঘুরে দাওয়ায় উঠে এল শশধর। খোলা দাওয়ায় সবকিছু বেশ পরিস্কার দেখা যাচ্ছে চাঁদের আলোয়। একপাশে উপুর করা একটা ঝুড়ি। খান কতক চ্যালাকাঠ, দু'টো আধেক ভরা বস্তা, একটা কোদাল, আর—

আর কোনও দিকে না তাকিয়ে সেখান থেকে একখানা চ্যালাকাঠ তুলে নিল শশধর। তারপর তা দিয়ে আলতো ঠেলা মারল দরজায়। দরজাটা তাতে ফাঁক হল সামান্য। সেই ফাঁক দিয়ে ভেতরে চোখ রাখতেই পা থেকে মাথা পর্যন্ত আগুন জ্বলে গেল শশধরের। অল্প করে জ্বলা ডুম লাইটের আলোয় স্পষ্ট দেখতে পেল বিছানায় চিত হয়ে শুয়ে থাকা ভুবনের বৌয়ের বুকের ওপর চড়ে নব—

কান, মাথা ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল শশধরের। দুই চোখে তীব্র একটা জ্বলন অনুভব করতেই নিজেকে আর ধরে রাখতে পারল না সে। ঝড়ের গতিতে ঘরের মধ্যে ঢুকে হাতের চ্যালাকাঠ দিয়ে প্রাণপণে 'বাড়ি' মারতে লাগল খাটের ওপর।

মুহূর্তে কিছু আর্তনাদ, গোঙানির আওয়াজ, আর প্রাণ বাঁচানোর আর্ত চিৎকারে রাতের নীরবতা খান খান হয়ে ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। আর তাতে তীব্র একটা ভালোলাগা অনুভব করে হাতের কাঠটা একপাশে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সশব্দ উল্লাসে ফেটে পড়ল শশধর।

ভুবনের বৌ নয়, আসলে সে এতক্ষণ নিজের বৌ সরলার ওপরেই তো কাঠটা চালিয়েছে।

নাটু হাজরা ও রমজান মাস

রাজকুমার শেখ

ও— জলিল কাকা, ওঠো গো। আত জি কাবার হয়ি গ্যালো। সেহেরি আঁধতে হবেনি? মা সকলকে ডাক দ্যাও দেনি।

ওরে— নাটু, রাত কত হল?

আমি তো আত এ্যাকটাই বের হলিম। হাঁক দিতি দিতি পছি পাড়া শ্যাষ করলিম। পুব পাড়ায় যাবু এবির।

নাটু, যা হাঁক দিতে। আমি ডেকে দিচ্ছি।

নাটু আর দাঁড়ায় না। হাঁক দিতে দিতে চলে যায়। সময় মতো ডাক না দিলে মা সকলরা সেহেরি রাঁধতে পারবে না। এই রমজান মাসটা তাকে রাত জেগে কাটাতে হয়। হাঁক দিতে দিতে ভোর হয়ে আসে বাড়ি ফিরতে। তারপর একটু ঘুমানো। সকাল হতেই তাকে কাজের সন্ধানে বের হতে হয়। সংসারটাকে কোনো রকমে সে ধরে রেখেছে। দুবেলা দুমুঠো অন্ন জোগাড় করতে তাকে হিমসিম খেতে হয়। আগের মতো আর শরীরে জোর নেই। তার কোনো সন্তান হয়নি। মাঝে মাঝে তার মন কেমন যেন করে ওঠে। কেউ তাকে বাবা বলে ডাক দেয়নি। বাবা শোনার জন্য মনটা আকুলিবিকুলি করে ওঠে। ওর বউ সোনা বলে, বাবা শোনার তুমার এত সাধ! আর মা বলি ডাকবি সে সাধ তো আমারও গো!

সোনা এ কথা বলতে গিয়ে আঁচলে মুখ চাপা দিয়ে ডুকরে ওঠে। রাতের মায়া জড়ানো বাতাস এসে বুকে লাগে নাটুর। ওরও চোখ ভারি হয়ে আসে।

সে বেশিক্ষণ সোনার পাশে শুয়ে থাকতে পারে না। রাতে তার মুসলিম পাড়া গিয়ে সেহেরির জন্য হাঁক দিতে হবে। চৌকিদারির কাজটা সে অনেক আগেই ছেড়ে দিয়েছে। তখন রায় বাবুদের কত রমরমা। তারই চোখের সামনে সব বদলে গেল। রায় বাবুরা চলে গেল শহরে। আসে পুজোর সময়। এখন আর আগের মতো তেমন জৌলুস নেই। কেমন সব ম্লান হয়ে গেছে। নাটু ছিল রায় বাবুদের চৌকিদার। তাকে সকলে ভালো বাসত। যা প্রণামী পেত তা দিয়ে বেশ চলছিল। রমজান মাসে হাঁক দেওয়া কাজটাতে এখনো সে বহাল আছে। তবে আর কতদিন সে এ কাজ করতে পারবে তার জানা নেই। শরীর আর আগের মতো সাথ দেয় না। চোখেও কম দেখে। তাই হারিকেনের বাতিটা বাড়িয়ে দেয়। লাঠিটা শক্ত করে ধরে ডাকতে থাকে মা সকলকে। তার ডাক শুনে সেহেরি রান্না করতে ওঠে। রোজা রাখে। রাতের অন্ধকারে মুক্ত বাতাসে ভাতের গন্ধ ম ম করে। নাটু বুক ভরে সে গন্ধ নেয়। সেহেরির সময় হয়ে এলে সে বাড়ি ফেরে। বুকে লেগে থাকে ভোরের শিশিরের গন্ধ। সদ্য রান্নার গন্ধ। এই ভাতের গন্ধ তার বহু দিনের চেনা। কত দিন ধরে সে হাঁক দিয়ে আসছে। তার কত আপনজন এ পাড়ার মানুষ। নাটুকে সকলে ভালোবাসে। নাটু ডাক না দিলে ভোরটা যেন মানায় না। সবার মুখে এক কথা। নাটুর ডাকে জেগে ওঠে গোটা পাড়া। হাঁড়ি কড়াই'এর শব্দ। মা বোনদের রাতের কথোপকথন। কেমন এক মায়াবী পরিবেশ। নাটুর কেমন ঘোর লেগে যায়। আগে সে এ সব ভাবতো না। ইদানীং তার মনটা কেমন উদাস হয়ে যায়। তার এই চেনা পরিবেশ হয়তো সে আর দেখতে পাবে না। শরীরটা আর তেমন চলে না। হাঁক দিতে কষ্ট হয়। হাঁপ ধরে বুকে। কাশি ওঠে। তবু সে রাতের পথ পেরিয়ে চলে। পুব পাড়া থেকে পশ্চিম পাড়া। সে থামতে জানে না। এই পবিত্র একটি মাসে সেও যেন কিছুটা পুন্যি করে নেয়। শুধুই কি কিছু চাল ডাল নগদ কিছু টাকার জন্যই কি হাঁক দেয়? সে বড্ড ভালো বেসে হাঁক দেয়। তার গলা কেমন রাতে গম গম করে ওঠে। পাড়ার লোক জেগে বলে, ওই যে নাটুকাকা হাঁক দিচ্ছে। সময় হলোগো ছোট বউ। ওঠো। ওরে আকবর, ডেকে দে।

গোটা পাড়া মুখরিত হয়ে ওঠে। রাত জাগরণের মাস। খোদার রহমতের মাস। ক্ষমার মাস। খোদাকে কাছে পাবার মাস। চোখের জলে ভিজে যায় বুক।

নাটু অনেক কিছুর সাক্ষী। পুব পাড়ার নেকছার মোল্লা রাতে জায়নামাজে বসে কাঁদতেন। নাটু হাঁক দিতে গিয়ে থেমে যেত। তার কান্নার শব্দ সে শুনতে পেত। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে নেকছার মোল্লা কাঁদছেন। কান্না শুনে নাটুর বুকটাও কেমন যেন করে উঠত। আজ নেকছার মোল্লা বেঁচে নেই। তার বাড়ির পাশ

দিয়ে গেলেই নাটুর মনটা খারাপ হয়ে যায়। সে হাঁক না দিয়ে একটু দাঁড়ায়। মানুষটার কথা ভাবে। বকুল গাছটার ডালে বসে একটা পেঁচা ডাকে। রাতের তারারা জেগে। নেকছার মোল্লার দালান বাড়ি পড়ে আছে। তার ছেলে মেয়ে বাইরে থাকে। দালান বাড়ি পড়ে আছে এক বুক শূন্যতা নিয়ে। খাঁ খাঁ করছে। শূন্য বাড়িটা যেন গিলে খেতে আসছে। নাটু আর দাঁড়ায় না। সে হাঁক দিতে দিতে চলে। আগের মতো হাঁটতে পারে না। নেকছার মোল্লার মতো তারও বুঝি সময় হয়ে এল। হাঁটতে হাঁটতে তার কতই না কথা মনে পড়ে। তার কেউই নেই। সোনাকেও সে তেমন ভাবে সুখ দিতে পারল না। মানুষটার জন্য ওর মনের কষ্ট বাড়ে। কেমন এক আগুনে আজও ও পুড়ছে। সোনা সন্তানের মুখ দেখতে চেয়েছিল। সেনার মনের ব্যথাটা ও বোঝে। শেষ সময়ে ওদের দুজনের কি হবে? এই ভাবনা সর্বদা কুরে কুরে খায় নাটুকে।

এই তারা ভরা রাতের আঁধারে ও কোথায় যেন হারিয়ে যায়। হাঁক দেওয়া শেষ করে এসে বসে বকুল গাছটার নীচে। একটা বিড়ি ধরাতে গিয়ে ও থেমে যায়। না— এমন পবিত্র রাতটাকে সে বিড়ির ধোঁয়া দিয়ে সে অপবিত্র করতে চায় না। আর মাত্র ক'টা দিন বাকি রমজানের। আসছে খুশির ঈদ। কত উপহার তার ঝুলিতে দেয়। নগদ টাকা। নতুন জামা। নাটুর মন ভরে যায়। তারও যে ঈদ। সোনাকে শাড়ি দেয়। লদুচাচা প্রতি বছর তার বউয়ের জন্য শাড়ি পাঠায়। নাটুকে ডেকে বলে, ওরে নাটু, এটা রাখ। বউমাকে দিবি। বউমাকে সঙ্গে করে ঈদের দিন আসিস। ক্ষীর পায়েস খেয়ে যাস।

শাড়িটা হাতে নিয়ে নাটু কেমন যেন অন্য মনস্ক হয়ে যায়। ওর দুচোখ ভরে জল আসে। কথা বলতে পারে না। লদু মিয়া হাত রাখে ওর পিঠে। হাত রেখে বলে, নাটু, ভালোবাসার কোনো রং হয়নারে। সেটা তোর চোখের পানি বলে দিচ্ছে। ভালো থাকিস তোরা।

এই পবিত্র রাতে তার সব মনে পড়ে যাচ্ছে। কত দিনের তাদের ভাব ভালো বাসা। নাটু হারিয়ে গেলে কে হাঁক দেবে? কত দ্রুত সময় বদলে যাচ্ছে চোখের সামনে। এখনো মাইক আসেনি এই সব গাঁয়ে। মাইক এলে তাদের প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে। হারিকেনের তেল শেষ হয়ে আসছে। নাটু আরও কিছুক্ষণ বসে থাকে। রাতের বাতাসে মিশে আছে ভাতের গন্ধ। ও বুক ভরে বাতাস নেয়। আর একটু পরেই ফজরের আজান হবে পুব পাড়ার মসজিদে। নাটু লাঠিটাতে ভর দিয়ে ওঠে দাঁড়ায়। পা টেনে টেনে সে হাঁটতে থাকে।

(২)

ওগো— আজ যেওনি। তুমার শরীলটা ভালো লয় গো!

সোনা নাটুকে বাধা দেয়। আজ সারাদিনই উঠতে পারেনি বিছানা থেকে। কিছু মুখেও দেয়নি। থালাতে যেমনকার ভাত তেমনিই থেকে গেছে। সোনা ওকে খাওয়াতে পারেনি। চোখের ঘুম ছাড়ছে না যেন। চোখ বন্ধ করে পড়ে আছে। সোনা কি করবে ভেবে পায়না। সোনা ওর কাছ থেকে নড়ে না। মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। তার এত দিনের জীবন সঙ্গী। সেই কবে এ বাড়িতে এসেছিল। তখন তার বয়সই বা কত হবে? নাটু ওকে বিয়ে করে এনে ঘরে তোলে। কিন্তু সুখ কি চিরদিন থাকে? নাটুর মনের ইচ্ছে সে পূরণ করতে পারেনি। তার জন্য ওর কেমন নিজেকে অপরাধী মনে হয়। কত কবিরাজি বদ্যি করেও তার পেটে সন্তান এল না। হতাশ হয়ে পড়ে নাটু। শেষমেশ সে আশা ছেড়েই দেয়। বেশ চলেই যাচ্ছিল। আজ হঠাৎ ওর কি হল? সোনা বেশ ভাবনায় পড়ে যায়। রাত হয়ে আসে। নাটু এক সময় ওঠে বসে। সোনা ওকে জিজ্ঞেস করে, হ্যাঁ গো— তুমি আজও যাবে?

ওরে আজ যে বড়ো আত। সাতাশের আত। পুন্যির আত। যেতি হবিরে। হাঁক না দিলি হবি!

হারকিন জ্বেলে ও বেরিয়ে পড়ে। শরীরটা টলছে। এলোমেলো পা পড়ছে। লাঠিটাতে ভর দিয়ে কোনো রকমে হাঁক দিতে চলে যায় ও।

ভোর হতেই ও ফিরে আসে। সোনার পাশে এসে ও শুয়ে পড়ে। সোনা ঘুমিয়ে। আজ বহু দিন পর নাটু ওর গায়ে পরম মমতায় হাত বুলিয়ে দেয়। তার ভালোবাসার সোনা। মানুষটার জন্য ওর বুক থেকে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। মানুষটাকে আজ ওর বুকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে মন করছে। কিন্তু তার শরীরে কেমন একটা অসার অসার লাগছে। সোনার পাশে শুয়ে সে ঘুমিয়ে পড়ে।

(৩)

খবরটা চাওড় হতে বেশি সময় লাগেনি পূর্ব পাড়া থেকে পশ্চিম পাড়ায়। সবার মুখে এক কথা। মানুষটা আজই ভোরে হাঁক দিয়ে গেছে। পাড়ার ছেলে বুড়ো সবাই ছুটল নাটুর বাড়ি। সোনা নাটুর মাথার কাছে বসে কাঁদছে। নাটু আর নেই। সবার মনটা ভারাক্রান্ত। কত সুখ দুখের সাথি নাটু। ও নেই কেউ ভাবতেই পারছে না।

ওকে গঙ্গা দেওয়ার জন্য এগিয়ে এল পূর্ব পাড়া ও পশ্চিম পাড়া থেকে ফরিদ ও সবুররা। ওর খাট কাঁধে নিয়ে চলল গঙ্গাতে। যেন তাকে নিয়ে যাচ্ছে ওর সন্তানরা স্বর্গের কাছে।

———

একটি মনকথা

সৌরভ হোসেন

"রানাঘাট থেকে হাজারদুয়ারি কীভাবে যাব একটু বলতে পারেন?"

'হোয়াটস অন ইয়োর মাইন্ড'এর শ্বেত শুভ্র জায়গাটা মনের এই কথাটা দিয়েই জিজ্ঞাসাটা টানল অদিতি। তারপর মিনিট খানেকের প্রতীক্ষা। মুহূর্তে 'লাইক' আর 'কমেন্টস'এর ঝড় বয়ে গেল। 'ইনবক্সে'র টিং টিং ম্যাসেজটোনটা এমন ঝাঁকে ঝাঁকে বাজতে লাগল যে, শব্দটা তার চরিত্র বদলে 'টিটিং' হয়ে উঠল। বন্ধুদেরকে ফেসবুকে এভাবে হুমড়ি খেয়ে পড়তে দেখে, আবারও ফিক করে হাসল অদিতি।

রাত গাছের মগডাল বেয়ে কালো হিজাব পরে নামছে। ঘড়ির কাঁটাতে এগারোটা বেজে দশ। অদিতি পাশবালিশটার ওপর বুকটা রেখে, উপুড় হয়ে শুল। স্টাডি ল্যাম্পটা জ্বলজ্বল করছে। নীচের রাস্তা থেকে মাঝেমধ্যে গাড়ির 'ভু' 'ভু' শব্দ মিহি করে ভেসে আসছে। দোতলার ব্যালকনির জানালাটা দিয়ে ঝিরঝির করে ঢুকছে উত্তরে বাতাস। কেমন একটা মাদকতাময় সময়। একটু মনে মাখলেই খেয়ালি মন গুনগুন করে উঠবে। কিন্তু অদিতির ওসবে খেয়াল নেই। তার বিস্ময়ভরা চোখজোড়া তখন ল্যাপটপের মনিটরে গেঁথে আছে। স্টেটাসটা দেওয়া মিনিট পাঁচেক হল আর তাতেই পঞ্চাশটার মতো কমেন্টস! এইতো কিছুদিন আগে, লিপস্টিকের আঁচড়ে আঁকা একটা টকটকে ঠোঁটের ছবি পোস্ট করেছিল অদিতি। ব্যস, আর বলতে নেই, কমেন্টসের চটুলতা দেখে, সারারাত মুখে বালিশ গুঁজে হেসেছিল অদিতি। সে জীবনে কখনও ছবি আঁকা শেখেনি। তার স্কুলের স্যাররা বলতেন, ছবি আঁকাতে তার মাথায় নাকি গোবর পুরা আছে। সে লিপস্টিক দিয়ে সেদিন যে ঠোঁটের ছবিটা এঁকেছিল, সেটা আসলে নারীর ঠোঁট না হয়ে একটা ধ্যবসা ছাপ হয়ে গেছিল। তবুও সুখ্যাতির অভাব হয়নি, 'ওয়াও', 'নাইস', 'ফাটাফাটি', 'উম্মা বলে গুচ্চের চুম্বনের ছবি', 'মাইরি জান জুড়িয়ে গেল', 'আমার ঠোঁটে মাখিয়ে নিলাম ডারলিং', 'আহা তাজা গোলাপের পাপড়ি গো', আবার কেউ কেউ লিখলেন, 'শেয়ার করলাম ডারলিং', কেউ কেউ আবার আরও বেশি উত্তেজিত হয়ে লিখলেন, 'একেবারে আমার হৃদয়ে সেভ করলাম মাই জান'। একজন ঈর্ষান্বিত হয়ে লিখলেন, 'এ ঠোঁটটা শুধু আমার জন্যেই পাঠিয়েছ তাই না সুইটি?'

অদিতি কৌতূহলের সঙ্গে কমেন্টসগুলো পড়তে লাগল, প্রথমজন লিখেছেন 'রানাঘাট থেকে সরাসরি ট্রেনে আসা যায়।' পরের জন পরামর্শ দিয়েছেন, 'রানাঘাট থেকে বাসেও আসা যায়, বাস ধরে সোজা বহরমপুর চলে এসো, তারপর সেখান থাকে বাস কিংবা ট্রেকারে করে মিনিট তিরিশের পথ

হাজারদুয়ারি।' পরের জন তো আগেরজনকে খোঁচা দিয়ে লিখলেন, 'বাস ট্রেকার ধরার কী দরকার? বহরমপুর বাসস্ট্যান্ড থেকে গঙ্গার ধার বরাবর হাজারদুয়ারি যাওয়ার জন্যে অটো ভাড়া পাওয়া যায়, ডারলিং তুমি ওসব ঝুটঝামেলায় না গিয়ে ডাইরেক্ট অটো ধরে চলে যেও। গঙ্গা দেখার মজাটাও উপভোগ করতে পারবে।'

পরের কমেন্টটাতে চোখ যেতেই চোখের মণিদুটো বড় হয়ে উঠল অদিতির, ভদ্রলোক একেবারে ইতিহাস ঘেঁটে দক্ষ গাইডের মতন লিখেছেন, 'শুধু হাজারদুয়ারি যাবে কেন? ওখানে অনেক কিছু দেখার আছে, যেমন ইমামবাড়া, কাটরামসজিদ, কাঠগোলাবাগান, নশিপুর রাজবাড়ি... গোটা মুর্শিদাবাদ শহরটা ঘুরে নাও। তবে সিরাজদৌলার প্রাসাদটা দেখতে পাবে না। ভাগীরথীতে বিলিন হয়ে গেছে। নতুন মতিঝিলটাও একবার ঘুরে নিও।'

বাকি কমেন্টসগুলো পড়তে পড়তে চোখ কপালে উঠে যাচ্ছিল অদিতির, 'লালবাগে আমার এক বন্ধুর ভালো হোটেল আছে, আমি তোমার নামে কি একটা ঘর বুক করে দেব? অনেক কমে হয়ে যাবে।'

পরের জন আগের জনকে ঠেস দিয়ে লিখেছেন, "হোটেলের জন্যে তোমাকে পকেট ধসাতে হবে না। ফোন নম্বরটা আমাকে ইনবক্সে দাও, আমি বুক করে দিচ্ছি। তোমার জন্যে এইটুকু করব না তো কী করব, ডার্লিং?" আর তারপরের কমেন্টসগুলো পড়ে তো অদিতি মুখে বালিশ দিয়ে হেসেছিল, 'তুমি কোন ট্রেনে যাবে? সকাল আটটার হাজারদুয়ারি এক্সপ্রেসে গেলে আমি তোমার জন্যে একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারি, ওই ট্রেনে আমার একজন চেনা টিটি থাকবেন, তুমি বললে আমি ওঁকে বলে রাখব, তোমার কোন অসুবিধা হবে না।'

'তুমি মুর্শিদাবাদ স্টেশনে নেমে আমাকে ফোন করো, আমার পারসোন্যাল কার আছে, আমার ফোন নম্বর ইনবক্সে সেন্ট করে দিলাম।'

একজন তো হাজারদুয়ারি যাওয়ার রুটম্যাপ এঁকে পাঠিয়ে দিলেন। ইনবক্সের একটা ম্যাসেজে গিয়ে চোখ থেমে গেল অদিতির। ভ্রূগুলো পারলে কপালে সেটে যায়। ম্যাসেজ সেন্ডারের নাম অরিত সেন। লোকটা গোপনীয়তা বজায় রাখার জন্য 'কমেন্ট' অপশানে না লিখে ডাইরেক্ট 'ইনবক্সে' লিখেছেন। ভদ্রলোক লিখেছেন, 'এত ঝুরঝামেলায় গিয়ে লাভ নেই, হাজারদুয়ারি কবে যাবে বলো, আমার এসি কার আছে, আমি ডাইরেক্ট তোমার বাড়ির আশপাশ থেকে তোমাকে তুলে নিয়ে গোটা লালবাগ বেড়িয়ে নিয়ে আসব।'

ম্যাসেজটা পড়া শেষ হতেই মুখ ভেংচে উঠল অদিতি, আদিখ্যেতা। ব্যাটা কৃপ্টের রাজা, চশমখোর, গায়ের জ্বর চাইলেও দেন না, সে লোকের আবার হুমড়ি খেয়ে পরের উপকার করার জন্যে এত ছটফটানি! আকাশ থেকে পড়ল অদিতি।

ফেসবুক অন করলেই গুচ্চের গুচ্চের ফ্রেন্ডরিকুয়েস্ট! হুড়মুড় করে

মুড়িমুরকির মতো তাকে ফ্রেন্ডরিকুয়েস্ট পাঠাবেনই বা না কেন, অদিতির প্রোফাইল পিকচারটা যে ঝাক্কাস। একে তো সুন্দরী মহিলা, তারপর মেরিচুয়াল স্টাটাসে লিখেছে 'সিঙ্গোল'। ফেসবুকে আসার দিন দশেকের মধ্যেই পূর্ণাঙ্গা শরীরের যে ছবিটা প্রথম আপলোড করেছিল অদিতি, সেই ছবিটাই মাত করে দিয়েছিল ফেসবুক। গোলাপি রঙের টাইট থিন টিশার্ট এর সঙ্গো লাইটব্লু ন্যারোজিন্স। টিশার্ট আর জিন্সটা এমনভাবে গায়ের সঙ্গো চেপ্টে লেগে আছে যে, টানটান পেশিগুলোর ভাঁজ ঝলসে উঠছে! নিরমেদ তন্বী শরীর। ছোবল মারা চোখের বাঁকা চাহনি। আর ছবিটার সঙ্গো ছোট্ট একটা ক্যাপশান, 'এই আগুনে কে কে পুড়তে চাও...।' ব্যাপারটা বেশ তাড়িয়ে তাড়িয়ে উপভোগ করছে অদিতি। এই দুনিয়ায় এসে সে অনেকেরই আসল রূপ চিনে ফেলেছে। অদিতি ফন্দি আঁটল, আজ বেটা অরিত সেনকে বাগে পেয়েছি, মালটাকে একটু বাজিয়ে দেখা যাক। দেখি অঁর গাঁটের পয়সা ঝরানো যায় কি না।

ম্যাসেনঞ্জারে গিয়ে একটা ছোট্ট করে ম্যাসেজ পাঠাল অদিতি, 'হাই'। ব্যস, সঙ্গো সঙ্গো 'ডপ' করে একটা শব্দ ভেসে উঠল অদিতির ল্যাপটপে। লোকটা ম্যাসেজটা 'সো' করলেন। তারপর 'পই' করে প্রত্যুত্তর দিলেন, 'হাই'। অদিতি দ্রুত ল্যাপটপের কি-বোর্ড খটমট করে লিখল, 'আমাকে একটু হেল্প করবেন?' অরিত সেন সঙ্গো সঙ্গো জবাব দিলেন, 'হেল্প কেন বলছ, হুকুম করো হুকুম, আমি তোমার কোন কাজে লাগতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করব।' অদিতি মনে মনে বলল, আদিখ্যেতা! তারপর অদিতি কিছু লেখার আগেই অরিতবাবু লিখলেন, 'কই? কী করতে হবে বলো?' অদিতি নিজের ওয়েটটা একটু বাড়ানোর জন্য আরও কিছুক্ষণ ঝিম মেরে থাকল। সে দেখছে, লোকটা কিছু একটা লিখছেন। বলতে বলতে আবারও 'পই' করে একটা ম্যাসেজ ঢুকল, সঙ্গো গুচ্চের গোলাপের স্টিকার। 'আমি বুঝতে পেরেছি, তুমি কথাটা বলতে লজ্জা করছ, কোনও লজ্জা নেই, জাস্ট মুখ খুলে একবার বলো তো, তারপর দেখ আমি তোমার জন্যে কী না করতে পারি।'

পাশ বালিশটা বুকে আরও ঠেসে উপুড় হল অদিতি। ঠোঁট চুইয়ে পড়া আদর মাখিয়ে লিখল, 'আমি না হাজারদুয়ারি দেখতে চাই, আমি কোনবার যাইনি, কী করে যেতে হয় বুঝতে পারছি না। আপনি যদি কাইন্ডলি একটু...।' বাক্যটা আর শেষ করল না অদিতি। একেবারে প্রেম ঢলিয়ে সেন্ট করে দিল। রাত আরও গভীর হয়েছে। ফেসবুকের নেশায় এমন ভাবে বুঁদ হয়ে আছে অদিতি যে, বুঝতেই পারেনি কখন কখন ঘড়ির কাঁটা একটার ঘর পেরিয়ে গেছে। রাস্তার 'ভু' 'ভু' শব্দও কমে এসেছে। ব্যালকনির জানালা দিয়ে এতক্ষণ ঝিরঝির করে আসা বাতাসটা এবার হু হু করে বইছে। শরতের শেষ। হেমন্ত দরজায় কড়া নাড়ছে। অদিতি খাট থেকে নেমে ব্যালকনির দিকে গেল। জানালার করিডোরে দাঁড়িয়ে একবার গা আশমোড়া দিল। জানালার ফাঁক

দিয়ে বাইরে দৃষ্টি ফেলে দেখল, নির্মল আকাশ, দূরে ফিনফিন করে কোয়াশা পড়ছে। আকাশের ক্যানভাস থেকে কবেই বিদায় নিয়েছে প্রথম শুক্লপক্ষের আধফালি চাঁদ। সেই ক্ষয়িষ্ণু আলোতে বড় বড় বাড়িগুলোর আধমরা ছায়া রাস্তায় চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। অদিতি জানালার কাঁচটা টেনে দিল। একটা 'হড়াম' করে শব্দ হল। আসলে নিশ্চুপ রাতে ছোট শব্দও বড় হয়ে ওঠে। অদিতি আশঙ্কা করল, মা টের পেয়ে যাবে না তো! জানালাটা লাগিয়েই ল্যাপটপটার কাছে ফিরে এল অদিতি। ম্যাসেজবক্সে তখন গোটা দশেক ম্যাসেজ। সবকটাই পাঠিয়েছেন অরিত সেন, 'হাই' 'হ্যালো' 'কী হলো' 'কথা বলছ না কেন?' ইত্যাদি ইত্যাদি। অদিতি লিখল, 'কীভাবে যাব বলুন না, প্লিজ, আমার একা যেতে খুউব ভয় পায়।'

ম্যাসেজটা পেয়েই অরিত সেন 'ধেই' করে নেচে উঠলেন। লিখলেন, 'তোমার কোন টেনশন নাই, আমিই তোমাকে আমার এসি গাড়িতে তুলে নিয়ে হাজারদুয়ারি দেখিয়ে নিয়ে আসব।' অদিতি চটপট লিখল, 'আমাকে যে শপিংমলে কিছু শপিংও করতে হবে, তাছাড়া আমি কোনদিন কোন ভালো রেস্টুরেন্টে যাইনি, আমার একবার যাওয়ার খুব শখ, কিন্তু কেমন কী খরচ হবে বুঝতে পারছি না তো?' অরিত সেন গডগড করে লিখলেন, 'ওসব খরচ নিয়ে তোমাকে একদম ভাবতে হবে না।' তারপরপরেই লিখলেন, 'কবে যাবে?' অদিতি জানাল, 'নেক্সট সানডে'। অরিতবাবু আবারও জানতে চাইলেন, 'টাইম?' অদিতি রিপ্লাই দিল, 'সকাল দশটা'। অরিত সেন এবার লিখলেন, 'কোথায় থেকে উঠবে, স্পট?' অদিতি লিখল, 'রানাঘাট স্টেশন'। লোকটি 'ওকে' বলে তার দু'দুটো মোবাইল নম্বর সেন্ট করলেন। তারপর অদিতির পারসোন্যাল মোবাইল নম্বর চাইলেন। অদিতি একটু ভেবে, তাদের কলেজের এঁচোড়পাকা বন্ধু গাবলুর ফোন নম্বরটা সেন্ট করে দিল, যে কিনা তার সঙ্গে বেট লেগেছিল যে অরিত সেনকে কেউ কখনও পটাতে পারবে না। সে যত বড়ই সুন্দরী হোক না কেন। আচমকা দরজায় 'খট' 'খট' শব্দ! অপর্ণা ঘোষাল দরজায় টোকা মারতে মারতে বলছেন, "কী রে দীপু, এখনও ঘুমোসনি? এত রাত জেগে কী করছিস?"

দীপু ওরফে অদিতি সিংহরায় ওরফে দীপঙ্কর ঘোষাল অপর্ণা ঘোষালের বিচ্চু ছেলে, 'এই সেরেছে রে' বলতে বলতে ফটাফট গুচ্চের চুম্বনের ছবি অরিত সেনকে সেন্ট করে তড়িঘড়ি ল্যাপটপটাটা মুড়ে পড়ার টেবিলে আলতো করে রাখল। তারপর বিছানার ওপরে চটজলদি অংকের খাতা আর ক্যালকুলাসের অঙ্ক বইটা হাট করে খুলে রেখে হনহন করে দরজার ছিটকানিটা খুলে বলল, "অঙ্ক করছি মা।"

বাঁশি

দীননাথ মণ্ডল

বাতাসে হিমেল ভাব। দুপুর গড়ালেই ঢলে পড়ে সূর্য। গাছের পাতায় নেমে আসে ক্লান্তি। দেখতে দেখতে আঁধার হয়ে যায় চারিদিক। আকাশ থেকে ঝরে পড়ে চাদর জড়ানো কুয়াশা। ঘাসের উপর জমতে শুরু করে বিন্দু বিন্দু শিশির।

দু'দিন থেকে গণেশের মন ভালো নেই। দুশ্চিন্তা ক্রমশ একটু একটু করে গিলে খাচ্ছে তাকে। এখনও একটাও বায়না আসেনি। এই সময়টার জন্য তো সারা বছর চেয়ে থাকা। এদিকে শীতের মরসুম আসতে আর ঢের দেরি নেই। তার কয়েক মাস আগে থেকেই শুরু হয়ে যায় তোড়জোড়। চারিদিকে সাজো সাজো রব। সাঁঝের আগেই ঘরে ফিরে আসে পাড়ার সকলে। ছোটদের মধ্যে অসীম উদ্দিপনা। বৃদ্ধদের মধ্যে যৌবনের আবেগ আবারও যেন মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। শরীরের বার্দ্ধক্যও হার মানে। অঙ্গাপ্রত্যঙ্গো নেমে আসে স্মৃতির তরঙ্গা। ছন্দ লয়ের মহড়া। কেটে যায় জড়তা। ছেলেছোকরাও এই সময় তাদের সম্মান করে। তাদেরও গুরুত্ব সকলেই উপলব্ধি করে। সন্ধ্যা হলেই বসে জমজমাট রিহার্সালের আসর। সারা বছরের রুজির অনেকটাই আসে এই সিজিন থেকে।

গতবার থেকে ভাটা পড়েছে উৎসবের মরসুমে। অনেকে পারিবারিক পেশা ছেড়ে পাথরের খাদানে পাড়ি দিয়েছে। গণেশও ভেবেছিল সব ছেড়েছুঁড়ে দিয়ে তাদের মতো সেও চলে যাবে। কিন্তু পারেনি। বাপঠাকুদার কথা স্মরণ করে। এ মাটিতে রয়েছে পিতৃপুরুষেরা স্মৃতি। কত ভালোবাসা। বংশ পরাম্পরা ঐতিহ্য। মাটির বুকে কান পাতলেই আজও শোনা যায় সে কথা। তাদের এই জাত ব্যবসা গণেশকে যে টিকিয়ে রাখতে হবে। না হলে পিতৃপুরুষের সুনামে পরবে কালি। এ অঞ্চলের লোকে তাকে ছিঃ ছিঃ করবে। বায়েনপাড়া অতীত কথা ভাবতে ভাবতে গণেশের দু'চোখ ভিজে যায়।

গ্রামের একপ্রান্তে বায়েনপাড়াটা আজও একা হয়েই রয়েছে। ধারেকাছে নেই কোন জনবসতি- পাড়া। কিছুটা দূরেই গ্রামের প্রতিটা পাড়া পরস্পরে আলিঙ্গানে লিপ্ত। আদানপ্রদান সৌহার্দে মিলেমিশে একাকার। জনসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হলে উত্তর থেকে বয়ে আসা ভাগীরথী নদী সাথ দিয়েছে বায়েনপাড়াকে। সন্ধ্যা নামলে গোটা গ্রাম নিশ্চুপ হয়ে গেলেও শব্দ ছন্দ বাঁশির সুরে বায়েনপাড়ার নিস্তব্ধতার অবসান ঘটে। মনসা মোন্ডপের প্রাঙ্গাণ সেজে ওঠে। ছেলেছোকরা, মাঝবয়েসী, বৃদ্ধ সকলেই যে যার বাজনা নিয়ে মহড়া শুরু করে। গণেশের আড়বাঁশি সর্বপ্রথম বেজে ওঠে। সেই তালেই সঙ্গা দেয় ঢোল কাঁসর আরও কত কী! গণেশের হৃদয় থেকে কন্ঠ ভেদ করে ওঠে আসে বাতাস। ভাবনার আবেগ। সৃষ্টির টান। বাঁশির প্রকোষ্ঠ ভেদ করে বেরিয়ে আসে সুর। সুরের জাদুতে সকলে মাতোয়ারা। এই সুরের টানে একদিন ঘর ছেড়েছিল অরুনা। ফুটফুটে সুন্দর মেয়েটি গণেশের

চেহারা দেখে নয়, বাঁশির জাদুতে বাবা মা-কে ছেড়ে গণেশের হাত ধরেছিল। তা না হলে এমন কুচকুচে কালো চেহারা, ঘাড় সমান চুল, বিক্ষিপ্ত দাঁতের পুরুষের প্রতি কোন মেয়ে আসক্ত হয়ে ঘর ছাড়ে? মাটির দো'চালা ঘর সেদিন থেকে তার রূপের আলোয় ভরে উঠেছে। 'গণশার বউটা দ্যাখতি এ্যাকদম য্যানো ড্যেনাকাটা পরি। জনমে জনমে পুণ্যি কোল্লে এ্যারূপ, চিহারা পুওয়া যায়।' পাড়ার খুদি-ঠাম্মা বউ দেখে প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

বিয়ের পর তাকে পাড়ার লোকে ডাকতে শুরু কালামানিক বলে। তাতে গণেশের বিন্দুমাত্রও রাগ হত না। বরং গর্বে বুক ভরে উঠত। অরুনাকে পেয়ে তার বাঁশি থেকে গড়ে পড়ত নিত্যনতুন সুর। কারণ এই সুরের টানে সে পেয়েছিল অরুনাকে। সুর দিয়েই তার ভালোবাসা সে দিন দিন নিংড়ে নিতে থাকে।

সন্ধ্যা নামতেই মনসা মন্দিরে দিকে গণেশ এগিয়ে যাই। পাড়াটা কেমন যেন আজ সুনসান। লাগবে না কেন, ছেলেছোকরারা বেশির ভাগই তো কাজে চলে গেছে। নিলুদের বাড়ির বাঁক পাড় করেই মন্দির। বাঁকের কাছে যেতেই নিলুর বাবা গণেশকে দেখে হাঁক দেয়।

- কি রে গণা, চললি নাকি?
- হ্যাঁ, খুড়ো।
- আর সব কই?
- মোন্ডপে গ্যায়ি দ্যাখি এ্যাকবার।
- তুর বাঁশির এ্যাকটা টান শুনা রে বাপ।
- ফিরার পাকে শুনাবো।

ঘাড় নেড়ে সম্মতি দেয় নিলুর বাবা। বছর দুয়েক থেকে প্যারালাইসিসে পা দুটি তার অসার। এখন বিছানায় সম্বল। মানুষটা ভালো ঢোলি ছিল। তার ঢোলিতে গণেশ বাঁশি নিয়ে অনেক দিন সঙ্গ দিয়েছিল। গণেশকে খুব ভালো বাসত বুড়ো।

মোন্ডপের চাতালে জনাকয়েক বসে আছে। গণেশকে দেখেই তারা জায়গা ছেড়ে সরে বসে। গণেশ যে তাদের গুরুদেব, উস্তাদ। এপাড়ার অনেককেই সে বাঁশি বাজাতে শিখিয়েছে। তার জুটি এ তল্লাটে মেলা ভার। আর মিলবেই বা কি করে। তার বাপ-ঠাকুদা যে ছিল পাক্কা বাঁশরীয়া। ঠাকুদা ফেলু বায়েন বাঁশির সুরে আকৃষ্ট করেছিল দেশ বিদেশের কত মানুষকে। একদিন নদীর ধারে বসে এক মনে সে বাঁশির সুর তুলছিল। মোহন বাঁশির সুর বাতাস বিদীর্ণ করে নদীর ঢেউয়ের তালে তালে মেতে উঠেছিল। বজরায় করে যাচ্ছিল ইংরেজরা। সে সুরে আকৃষ্ট হয়ে তারা বজরা ভেড়াই তীরে। পিঠ থাবড়ে বাহবা দেয়। নদীর অদূরে তাকে জায়গা প্রদান করে। আজ সেই জায়গায় গড়ে উঠেছে বায়ানপাড়া। এই পাড়ার মাটিতে মিশে আছে ঠাকুদার বাঁশির সুর। সম্মান। ভালোবাসা। কান পাতলে সে সুর শুনতে পাই গণেশ। একথা ভাবলেই তার বুক প্রশস্ত হয়ে যায়। গর্বে ভরে ওঠে। বাঁশির ছিদ্র বেয়ে বেরিয়ে আসে সুরের অলংকার,

শব্দের ঝংকার।

রাতে ঘরে ফিরে গণেশ। দরজার চৌকাঠে বসে আছে বৌ। গালে হাত। কয়েকদিন থেকে ছেলেটা অসুস্থ, বিছানাগত। টাকার অভাবে যেতে পারেনি ডাক্তারের কাছে। আজ অসুখটা অনেক বেড়ে গেছে। গণেশকে দেখে বউ ঘরে মেঝেতে ছেলের পাশে যায়।

- খুকার মাথা তেতে এ্যাকেবারে ফাল গো।

- জল পটি দিইছিস?

- সাঁজে এ্যাকবার দিইছি।

- আর এ্যাকবার দে দিকি।

এক ঘটি জল এনে দেয় গণেশ। বৌ ন্যাকড়া ভিজিয়ে খুকার মাথায় জল পটি দেয়। ছেলের হাত পা মাথায় গণেশ হাত বুলিয়ে পরখ করে জ্বর কমছে কিনা। বেশ কিছুক্ষণ বাদে মাথাটা ঠান্ডা হয়ে আসে।

বিছানায় সারা রাত তার দু'চোখ একবারের জন্যও বুজেনি। বারবার ছেলে মাথায় হাত বুলায়। একমাত্র বুকের ধন তার। এ বংশের বাতি। তাকে নিয়ে কত স্বপ্ন।

ভোরে হতেই হুড়মুড় করে বিছানা ছেড়ে ওঠে গণেশ। দেওয়ালে ঝোলানো আড়বাঁশিটা পুরে নেয় ব্যাগে। বউকে বলে শহরে যাচ্ছি। খুকার দিকে নজর দিও। তাড়াতাড়ি ফিরে আসব। একটা বড়ো মাঠ পেরিয়ে স্টেশন। হুসমুস করে একরকম দৌড়েই স্টেশনে পৌছায় সে। ৬ টার ট্রেন ধরে শহরে পৌঁছায়। যাত্রা দলের মালিক সমরের সঙ্গে দেখা করে। যে তাকে বাঁশিটা বেচার জন্য একবার বলেছিল। তিন পুরুষের আগের বাঁশি মিউজিয়ামে রাখার জন্য অনেকে চড়া দামে নেবে। মনে মনে সেদিন গণেশের দারুণ রাগ হয়েছিল। কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলতে পারেনি। অন্য কেউ হলে হয়তো তার মাথা ফাটিয়ে দিত। সমরে যাত্রা দলের একজন ভালো বাঁশরীয়া ছিল সে। তাকে সে সম্মান করত। সেই যাত্রা দল আজ লাটে উঠে গেছে। যাত্রার প্রতি লোকজনের আর ভক্তি নেই। যাত্রা দলের পুরানো জিনিসপত্র সমর একে একে সব বিক্রি করে দিয়েছিল। সে সময় সমর গণেশকে বাঁশিটা বিক্রি করতে বলেছিল। কিন্তু গণেশ রাজি হয়নি। বাপ-ঠাকুদার কথা স্মরণ করে। আজ যে সে অসহায়। নিরুপায়।

সমরকে বাঁশি ব্রিক্রি করে টাকা নিয়ে বাড়ি ফিরে আসে গণেশ। আজ যেন বুকের কলজে ছিঁড়ে গেল তার। বাড়ি ফিরেই ছেলেকে নিয়ে স্বামী স্ত্রী দুজনেই গ্রামের হাতুড়ি ডাক্তারের কাছে গেল।

এ ক'দিন সে আর মনসা মন্দিরে যায়নি। দু'একজন তাকে ডাকতেও এসেছিল। তাদের বলেছিল শরীর ভালো নাই। দিন দুয়েক পর ছেলে সম্পূর্ণ সুস্থ্য হয়ে উঠলে রাতে গিন্নিকে বলে - পুটলা বাধ, কাল কামে যাবু।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে দু'পা এক পা করে নদীর দিকে যায়। চারিদিক সুনসান।

রাতে এদিকে লোকজন তেমন কেউ আসে না। নদীর পাড়ে বিশাল বট গাছ। ডালপালা বেয়ে ছোট বড়ো অসংখ্য ঝুরি মাটিতে নেমেছে। গাছের কোনটা আসল কাণ্ড খুঁজে পাওয়া মুশকিল। গাছের শিকড়ের উপর ধপ করে বসে নদীর পানে চেয়ে থাকে সে। ছেলেবেলায় দেখেছে এই নদীর বুকে কত বড়ো বড়ো পালতোলা নৌকা বজরা চলতে। দুপুরে নৌকা থামিয়ে গাছের গোড়ায় বসে অনেকে ক্লান্তি জিরিয়ে নিত। কেউ বা গুড় পিটালি নিয়ে নদীর জলে জিরে ভিজিয়ে বসে বসে খেত। সময় পাল্টে গেছে। নদীতে সেরকম নৌকা চলে না। কিন্তু গাছটি আজও সেরকমই হয়ে আছে। এই গাছের বয়স কত কেউ বলতে পারে না। বাপ ঠাকুদার মুখে গাছের গল্প অনেক শুনেছে। বাপ ঠাকুদার বাঁশির কত সুরের সাক্ষী এই গাছ। সময়ে অসময়ে সেও তো এই গাছের গোড়ায় বসে বাঁশি বাজাত। গাছও নীরবে শুনত সেই সুর। আজ সে বাঁশি হারা। সুর হারা। ঐতিহ্য ছাড়া। অভাবী মানুষ। চোখের কোণা বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রুধারা ঝরে পড়ে গাছের শিকড়ে। আকাশের আধখানা চাঁদের আলো পাতার ফাঁক দিয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে এসে তার দু গালে চিকচিক করছে। নদীর ঢেউয়ে আলোর তরঙ্গা খেলা করছে। কিছুক্ষণ পর ওঠে নদীর জলে কাছে এগিয়ে যায় সে। একমনে চেয়ে থেকে জলের দিকে, দুহাত মাথাতে ঠেঁকিয়ে বিড়বিড় করে কি যেন বলে। দু খাবল জল তুলে মুখ ধুয়ে আবার ওঠে আসে গাছের গোড়ায়। হাঁটু গেড়ে বসে দু'হাত ছড়িয়ে মাথা ঠেঁকাই শিকড়ে। নিঝুম রাত ভেদ করে তার কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে আসে অস্ফুট কিছু বিড়বিড় শব্দ। শুক্লপক্ষের চাঁদ ক্রমশে দিগন্তে ঢলে পড়তে বাড়ি ফিরে আসে সে।

এদিনও সারা রাত একবারের জন্য চোখের পলক বুজেনি। ভালোবাসার টান ক্রমশ আলগা হয়ে আসছে তার। বাপ ঠাকুদার প্রতিশ্রুতি পালন করতে অপরাগ। বংশের ঐতিহ্য নিজের হাতে ধ্বংস করল। সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে বিছানায় রাত ফুরিয়ে এল।

ভোর তিনটে সময় গণেশ ওঠে গিন্নিকে ডাকে - 'ওঠ, অবুনা, ফর্সা হয়্যি এলো। জেতি হবি।' বিছানা ছাড়ে অবুনা। দুজনে হাত মুখ ধুয়ে নেয়। ছেলেকে ঘুম থেকে তোলে গিন্নি। বছর পাঁচেক ছেলেকে গিন্নি কোলে এবং গণেশ পুটলাটা মাথায় নেয়। বাড়ি থেকে বেরিয়ে গ্রামের বাইরের মাঠের জমির আল ধরে চুপিচুপি স্টেশনের দিকে পা বাড়ায়। কুয়াশা জড়ানো এ পথটি এঁকেবেঁকে এগিয়ে চলেছে স্টেশনের পানে। কিছু দূর গিয়ে একবার পেছন ফিরে তাকাই গণেশ। দূরের কিছুই দেখা যাচ্ছে না। কুয়াশায় ঢাকা পরে আছে গ্রামটা। যত এগিয়ে যায় পিছনের গ্রামটা ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। আবার সামনের দিকে এগিয়ে চলে। স্টেশনের কাছে এগিয়ে যেতেই দূর থেকে একটা শব্দ ক্রমশ কানে একটু একটু জোরে ভেসে আসছে। যতই এগিয়ে যায় শব্দটা আরো স্পষ্ট হয়ে উঠছে। রেললাইনের ধারে হাতুড়ি দিয়ে পাথর ভাঙার শব্দ — ঠক্ ঠক্ ঠক্...

প্রসঙ্গ ঃ ফেরিওয়ালার ছড়া

কৌশিক বড়াল

জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস সংকলিত 'বাঙ্গালা ভাষার অভিধান' অনুসারে 'ফেরি' শব্দের অর্থ 'বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া বিক্রয় করা' এবং 'ফেরিওয়ালা'র অর্থ 'যে ফেরি করে বেড়ায়'। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্গীয় শব্দকোষ'-এ 'ফেরি/ফেরী' শব্দের অর্থ — (১) 'পণ্য বিক্রয়ার্থ গ্রামে গ্রামে বা গলি গলি ফেরা বা বেড়ান'; (২) 'গ্রামে গ্রামে বা বাড়ী বাড়ী ফিরিয়া পণ্য বিক্রয়' এবং 'ফেরিওয়ালা/ফেরীওয়ালা' শব্দের অর্থ 'ফেরি করিয়া বেচার ব্যাপারী'। একথা অনস্বীকার্য যে, গ্রামে বা রাস্তায় বা বাড়িতে বাড়িতে ঘুরে ঘুরে জিনিসপত্র বিক্রয়কারীদের ফেরিওয়ালা বলা হয়। অবশ্য শুধু জিনিসপত্র বিক্রয়ই নয় প্রয়োজনে পরিষেবা দান (শিল কোটানো) বা বিনিময় (পুরনো কাপড়ের পরিবর্তে বাসন দেওয়া) প্রথার মাধ্যমেও 'ফেরি করা বোঝানো হয়'। তাই 'ফেরিওয়ালা'র সংজ্ঞা হওয়া উচিত— 'যারা গ্রামে গ্রামে বা বাড়ি বাড়ি ঘুরে ঘুরে পণ্যসামগ্রী বিক্রয়, নানান জিনিস সারাই, বিনিময় প্রথার মাধ্যমে পরিষেবা দান, এমনকি প্রয়োজন বিশেষে বাড়ির পুরোনো অব্যবহার্য জিনিসপত্র ক্রয় করে থাকে। ফেরিওয়ালা স্ত্রী বা পুরুষ দুই হতে পারে। এরা গ্রাম-গঞ্জে গলা ছেড়ে হাঁক দিয়ে যায়; সময় বিশেষে বিভিন্ন রকমের ছড়াও বলে থাকে'।

তখন বাজারে বহুজাতিক সংস্থার চকলেটের রমরমা ছিল না। গ্রামে-গঞ্জে শোনা যেত লজেন্স-বিক্রেতার ডাক। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা দল বেঁধে ছুটে যেত তার কাছে। সে বলেই চলেছে—

'দেখতে কালো খেতে ভালো
টক ঝাল লজেঞ্জুস এলো।'

গ্রামগঞ্জে লজেন্সকে লজেঞ্জুস বা লেবেঞ্জুস বলা হয়। কাঁচের বয়ামে লাল হলুদ বা কালো রঙের লজেন্স থাকত। পয়সার বিনিময়ে ফেরিওয়ালা বাচ্চাদের হাতে লজেন্স তুলে দিত। বড়োরাও মাঝেমধ্যে এই লজেন্স কিনে মুখের স্বাদ মিটিয়ে নিতেন।

ঘাড়ে বাঁক, বাঁকের দু'দিকে হাঁড়ি, কড়াই, বাটি, খুন্তি নিয়ে হাঁক দিয়ে যেত বাসনওয়ালা। বাড়ির মা-কাকিমারা বাড়ির দুয়ারে যেতেন জিনিসপত্র কেনার জন্য। চলত দর কষাকষি। বাসনওয়ালা মাঝেমধ্যেই ছড়া কাটত—

'স্টিলের হাঁড়ি লেবেন নাকি
টিকসয়ের আছে গ্যারান্টি

কড়াই খুন্তি নিলে পরে
রানি হবেন রান্নাঘরে।'

বাড়ি বাড়ি সবজি ফেরি করে বেড়ায় সবজিওয়ালা। 'সবজি লিবেন গো সবজি' ডাক শুনে বাড়ির মহিলারা রাস্তার দিকে যেতে থাকেন। সুর করে সবজিওয়ালা বলতে থাকে—

'সবজি লিবেন সবজি
টাটকা টাটকা সবজি
আলু পাবেন পটল পাবেন
পাবেন ঢেঁড়স লাউ
মুলো আছে করলা আছে
যেমন খুশি নাও
কুমড়ো মিষ্টি, ঝাল লঙ্কা
লিবেন নাকি মাসি
আদা রসুন সব আছে
সুকুর সবজি টাটকা সবই
দিব না কখনও বাসি।'

থেকে থেকেই শোনা যায়— 'স্টিলের বাসন, পুরোনো শাড়ি, জামার বদলে নেবেন নাকি।' মূলতঃ বাড়ির মহিলারা এ ডাক শুনে দরজার পাশে এসে দাঁড়ান। বাক্স বা আলমারিবন্দী পুরনো শাড়ি, চুড়িদার, নাইটি, জামা-প্যান্ট এমনকি বিছানার চাদর দিয়ে তাঁরা ফেরিওয়ালার কাছ হতে স্টিলের বাসনপত্র নেন। সময় বিশেষে ছড়া এরা কাটতে থাকে—

'কাকিমা জ্যেঠিমা মাসি পিসি
আছে নাকি পুরনো বেনারসী
শাড়ি, জামা, চুড়িদার, নাইটি
বদলে নিন স্টিলের বাটি
গামলা, কড়াই, গিলাস, হাঁড়ি
আমরা এসেছি আপনার বাড়ি।'

গ্রাম বা শহরে সময় সময় শোনা যায়— 'শিল কুটানি... শিল কুটানি নেবেন গো'। শিল-নোড়ার গা কুঁদে দিতে হাতুড়ি-বাটালি নিয়ে ফেরিওয়ালা বাড়িতে হাজির। অনেক সময় তারা ছড়া বলতে থাকে—

'শিল কুটা চাই
এসছি আপনাদের গাঁয়
শিলটা আগে কুটে দি

পরে পয়সা দেবেন দিদি।'

বাদাম ফেরি করে অনেকে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। 'অ্যাই বাদাম' বলতে বলতে তারা বাদাম বিক্রি করে থাকে। কোন কোন বাদাম ফেরিওয়ালা ছড়াও বলতে থাকে—

'খোলা শুদ্ধ বাদাম— খোলা শুদ্ধ বাদাম
একশো নিন দশ টাকা দাম।
সাথে আছে বিটলবণ ফিরি
আসুন দাদা, আসুন দিদি তাড়াতাড়ি।'

বর্তমানে সাইকেল বা মোটরসাইকেলে পেষাই করার মেশিন বেঁধে বাড়ি বাড়ি ছোলার ছাতু বিক্রি করা হচ্ছে। বিক্রেতা বাড়ির লোকেদের সামনে ছোলা পিষে ছাতু বানিয়ে দেয়। সময় বিশেষে তাদের মুখে ছড়া বলতে শোনা যায়—

'কাকিমা মাসিমা আসুন সবাই
সবার সামনে করবো পেষাই।
গোটা ছোলা থেকে হবে ছাতু
খাবে বাড়ির নাতু-পুতু।'

আগে ঘরে ঘরে বিক্রির জন্য নানান রকমের ডাল নিয়ে আসত ফেরিওয়ালারা। ডাল বিক্রির জন্য তারা সুমিষ্ট স্বরে ছড়া কাটতো—

'ডালের রাজা মুগডাল
মন্ত্রী হল মসুরডাল
সঙ্গী আছে মটরডাল
ছোলার ডাল আর অড়হর ডাল
লিবেন যদি এসব মাল
বদলে যাবে সব হালচাল।'

শাঁখা পরাতে শাঁখাওয়ালারা গ্রামগঞ্জে বা শহরের বাড়িতে বাড়িতে ঘুরে বেড়ান। বাড়ির বিবাহিত মহিলারা তাদের কাছে শাঁখা পরে থাকেন। টিনের বাক্সে খুব সুন্দরভাবে শাঁখাগুলো রাখা থাকে। শাঁখাওয়ালারা মহিলাদের শাঁখা পরানোর সময় নানান ছড়া বলতে থাকে—

(১)

'সোনার গয়না না থাকিতে পারে
শাঁখা বিনা হাত শূন্য মাঝারে
দাও মোরে শাঁখা হাতে পরিয়ে
প্রণাম করি দুর্গারে দুই হাত দিয়ে।'

(২)

'শাঁখা ডাক শুনে রমনীরা চায়
শাঁখাওয়ালা তখন হাত দুটি নেয়
দুই হাতে শাঁখা পরায় নমস্কার করি
সকলে বলুন হরি হরি।'

গ্রামে-গ্রামে বা শহরে ছুরি কাঁচি, বটি শান দেওয়ার জন্য শানওয়ালারা ঘুরে বেড়ায়। ঘাড়ে শান দেওয়ার মেসিন নিয়ে তারা হাঁক পাড়ে— 'শান দেবেন গো— ছুরি কাঁচিতে শান'। অনেক সময় তারা নানা রকমের ছড়া কাটতে কাটতে যায়—

'শান দিবেন গো শান
ছুরিতে শান কাঁচিতে শান
বটিতে শান হেঁসোতে শান
ভাত খান বা না খান
জল খান বা না খান
রাখতে বাড়ির মান
শান দিন গো শান।'

আগে মাথায় ঝুড়িতে করে মাটির পুতুল, খেলনা নিয়ে গ্রাম-গঞ্জে পাড়ায় পাড়ায় ফেরিওয়ালা ঘুরে বেড়াত। তারা সুর করে ছড়া বলত—

'খোকা খুকু শুনে যা না
মাথায় ঝুড়িতে হরেক খেলনা
রাম রাবণ ভীম হনুমান
কেবল পাঁচ টাকা দাম
নেবে তো চলে এসো
খেলনা নিয়ে জমিয়ে বসো।'

তথ্যসূত্র ঃ

১। বাঙ্গালা ভাষার অভিধান — জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস ২। বঙ্গীয় শব্দকোষ — হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
৩। আব্দুল করিম শেখ, সালার, মুর্শিদাবাদ ৪। মজিদ আলি, বেলডাঙা, মুর্শিদাবাদ
৫। সুবল বিশ্বাস, গাজনা, নদীয়া ৬। জুলু সেখ, তালিবপুর, মুর্শিদাবাদ
৭। স্বপন বিশ্বাস, কালীনারায়ণপুর, নদীয়া ৮। সুনীল মালাকার, আনোখা, মুর্শিদাবাদ
৯। শ্রীনিবাস পাল, দেবগ্রাম, নদীয়া ১০। সুকুর সেখ, সিজখালি, মুর্শিদাবাদ
১১। রফিক সেখ, কুমারপুর, মুর্শিদাবাদ ১২। সঞ্জয় দাস, গান্ধী কলোনি, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ

———

‘সে কাল — এ কাল’ বেলডাঙায় সাহিত্য পত্রিকা ও সাহিত্যচর্চা

রূপক কুমার চট্টোপাধ্যায়

দিন যায়, সৃজনশীল সাহিত্য সমাজে স্মৃতি রূপে মানুষের মনের অন্তরে জেগে থাকে। ‘কিছু করবার ইচ্ছা’ শক্তির দামাল ছেলে-মেয়েরা সমাজে দাগ কেটে যায়। সমাজের ভিড়ে তাঁরা হারিয়ে গেলেও তাঁদের অমর সাহিত্য সৃষ্টি সমাজের বুকে, সভ্যতার গতিতে অমরত্ব লাভ করে। এই সাহিত্য তো সমাজের দর্পণ। সে সাহিত্য লোকসাহিত্য, লোকসংস্কৃতি, দেওয়াল পত্রিকা, ছাপানো পত্রিকা, হাতে লেখা পত্রিকা— সব কিছুই হতে পারে।

এই শিষ্ট সাহিত্যই সমাজের বিশ্বস্ত দলিল, অতীত ইতিহাসের জীবন্ত সাক্ষী। এই সাহিত্য মানব হৃদয়ের মানব চরিত্রের সুস্পষ্ট প্রতিফলন। আর আমার আলোচ্য অতীত দিনের বেলডাঙার সাহিত্যচর্চা ও পত্র-পত্রিকার গুণান্বিত প্রতিভা ও তাঁদের ক্ষুরধার রচনার বিষয়।

বেলডাঙা অতি প্রাচীন জনবসতিপূর্ণ অঞ্চল। অনেক গুণীজনের আগমনে এই স্থান পবিত্র। প্রাচীনকালে রাজা-মহারাজ, সুলতান ও নবাবের আমলেও সাহিত্য এবং শিল্প সংস্কৃতি চর্চা ছিল।

স্বাধীনতা লাভের পর বেলডাঙায় সাহিত্য ও পত্র-পত্রিকা প্রকাশনার জোয়ার এসেছিল। একদিকে সুরেশ ভদ্র, তিমির ভাদুড়ী, সন্তোষ রায়, স্মৃতি বিকাশ বোস প্রমুখ ব্যক্তিরা বামপন্থী আন্দোলনের প্রয়োজনে পত্রপত্রিকা সৃষ্টি করেন। খোদাবক্স সাহেব, লতিফ সাহেব, অনিল বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্ষিতীশ ঘোষ প্রমুখ কংগ্রেসী ব্যক্তিরা গান্ধীবাদী নীতিতে বিশ্বাস রেখে জ্ঞান চর্চা শুরু করেন। ডাঃ রাধাপদ প্রামাণিক, বলরাম সেনগুপ্ত প্রমুখ ব্যক্তিরা নেতাজির আদর্শ সামনে রেখে সাহিত্য চর্চা শুরু করেন।

আমার ঠাকুরদা হরিপদ চট্টোপাধ্যায় হরেকনগর আব্দুল মোমেন ইনস্টিটিউটশনের শিক্ষক নেতাজি পার্কে বেলডাঙার সহৃদয়বান ব্যক্তিদের সাহায্য নিয়ে অবৈতনিক শিক্ষা কেন্দ্র চালু করেন। দেওয়াল বোর্ডে পড়বার বিভিন্ন বিষয় লিখে রাখতেন। অতীত থেকেই সাহিত্য চর্চা শুরু হয়।

দেশ স্বাধীনতা লাভের পর মুর্শিদাবাদ জেলায় বিশেষত বেলডাঙায় বৈপ্লবিক দলের (R.S.P) সংগঠন দারুণ বৃদ্ধি পায়। এই সময় বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দলের সংগঠন কৃষক, খেতমজুর, মুঠে-মজুর রিক্সা-ভ্যান চালক, রেল ও মারুয়ের (ধান্য ক্রয় কেন্দ্র) শ্রমিক ও হকারদের মধ্যে সংগঠন বৃদ্ধির জন্য সুরেশ ভদ্র’কে R.S.P দল বেলডাঙায় আনেন। R.S.P. দলের এই কৃষক ও শ্রমিক নেতা যাটের দশকে ‘বালার্ক’ নামে শারদীয়া সংখ্যা প্রকাশ করতে শুরু করেন। এই পত্রিকায় বিভিন্ন সমাজতন্ত্রী নেতার লেখা প্রকাশ হত। এই সাহিত্য গোষ্ঠী

'বিশ্বায়ন গোষ্ঠী' নামে পরিচিত ছিল। বেলডাঙা কেন্দ্রিক সুরেশ ভদ্র সম্পাদিত 'বালার্ক' নামক শারদ সংখ্যা মুর্শিদাবাদ সহ কোলকাতা ও সারা পশ্চিমবঙ্গা, আসাম, ত্রিপুরাতে ব্যাপক সারা ফেলেছিল।

সত্তরের দশকে বেলডাঙার ভূমিপুত্র (দেবকুন্ডু) বেলডাঙা শিউ নারায়ণ রামেশ্বর ফতেপুরিয়া কলেজের বাংলা বিভাগের ছাত্র আহসান হাবিব ছোট্ট ও মাঝারি সাহিত্য পত্রিকা সম্পাদনার জন্য বেলডাঙা বাসীর কাছে বিশেষভাবে স্মরণীয়। তাঁর সম্পাদিত ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকার নাম ছিল 'দূত'। আহসান হাবিব 'কাকাতুয়া' ছদ্মনামে কবিতা লিখতেন। তাঁর বন্ধু ও বেলডাঙা কলেজের বাংলায় অনার্স বিভাগের সহপাঠী হরেকনগরের তপন রায় 'দূত' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক ছিলেন। সম্পাদক মহাশয় নিজ উদ্যোগে কবি বিষ্ণু দে, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও নানা গুণী ব্যক্তিদের লেখা সংগ্রহ করে পত্রিকায় প্রকাশ করতেন। যেমন— আমার বেশ মনে আছে কবি বিষ্ণু দে'র 'হে রাতের চাঁদ' কবিতা এই পত্রিকায় প্রকাশ হয়েছিল। কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে 'বেলডাঙা নেতাজি পার্ক' বিশেষ সম্মান জানিয়ে পার্কে নেতাজির জন্ম উৎসবে এনেছিলেন। আহসান হাবিব শেষ জীবনে বীরভূম বসবাস করতেন। ইনি সম্প্রতি প্রয়াত হয়েছেন।

'দূত' পত্রিকার সমসাময়িক ১৯৭০ এর দিকে সেখ মোহাম্মদ কাদির আলি'র সম্পাদনায় বেলডাঙা থেকে 'মন' নামে আরও একটি ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশ হত। সম্পাদক কাদির আলি বেলডাঙায় মাননীয় লতিফ সাহেবের বাড়িতে বিশেষ অতিথির রূপে বেলডাঙা কলেজে বাংলা অনার্স নিয়ে 'দূত' পত্রিকার সম্পাদক আহসান হাবিব ও তপন রায়ের সঙ্গো পড়তেন। কাদির সাহেব বার্নিয়া উচ্চ-মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহ-শিক্ষক পরে প্রধান শিক্ষক রূপে কর্মজীবন শুরু ও শেষ করেন। তপন রায় এই 'মন' পত্রিকার সহ-সম্পাদক ছিলেন।

এই সময় বেলডাঙা মেছো বাজারের (মাছের বাজার) মারুয় (ধানের বাজারের পাশে) বিখ্যাত চা'য়ের দোকান ছিল। চা'য়ের দোকানের নাম ছিল খুব সুন্দর ও মিষ্টি 'ক্লান্তি বিনোদক' যা ঐ সময় বেলডাঙার 'কফি-হাউস' নামে খ্যাতি লাভ করেছিল। বেলডাঙার বিশিষ্টজনদের ঐ স্থানে গল্প ও আলোচনার কেন্দ্র ছিল।

বেলডাঙা কাশিমবাজার রাজ গোবিন্দ সুন্দরী বিদ্যাপীঠের কয়েকজন ছাত্র যেমন, কলোনির সন্তোষ রঞ্জন দাস, বেলডাঙার সারথি চৌধুরী, সত্যব্রত সিংহ রায়, বাবুপাড়ার প্রদীপ মুখার্জী, আন্ডিরনের কেশব স্মরণ মণ্ডল প্রমুখ ছাত্ররা বিদ্যালয় শিক্ষক সদ্যপ্রয়াত হরি নারায়ণ মণ্ডল ও প্রধান শিক্ষক অরুণ গাঙ্গুলির সহায়তায় ১৯৭২ সালে 'ছাত্রকণ্ঠ' নামে দেওয়াল পত্রিকা বের করতে শুরু করেছিল। নবম, দশম ও একাদশ শ্রেণিতে পাঠরত অবস্থায় এই পত্রিকা বের

হত। সম্পাদক ছিলেন সন্তোষ রঞ্জন দাস।

১৯৭৫ সাল থেকে নেপাল সরকারের সম্পাদনায় ও সন্তোষ রঞ্জন দাসের সহকারি সম্পাদনায় 'কিংশুক' সাহিত্য পত্রিকা পথচলা শুরু করে। 'কিংশুক' দেওয়াল পত্রিকাও ছিল। প্রকাশক ছিলেন প্রদীপ মুখোপাধ্যায়। ত্রৈমাসিক রূপে বের হত। ১৯৯২ সালে বিশেষ রবীন্দ্র সংখ্যা প্রকাশ হয়েছিল। মাননীয় মনীশ ঘটক, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, বিপ্লবী ও অধ্যাপক রেজাউল করিম প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের লেখা প্রকাশ হয়েছিল।

জগন্নাথ মজুমদারের সম্পাদনায় ১৯৯০ সাল থেকে 'বেলডাঙ্গা বার্তা' নামে সংবাদপত্র প্রকাশ হতে শুরু করে। ছয়টা সংকলন প্রকাশ হবার পর পত্রিকাটি রেজিস্ট্রেশন নম্বর লাভ করে এবং 'বেলডাঙ্গা সমাচার' নামে প্রকাশ হতে শুরু করে। সন্তোষ রঞ্জন দাস ছিলেন প্রকাশক। জগন্নাথ মজুমদার 'বর্তমান' সংবাদপত্রের সাংবাদিক ছিলেন। সেবাব্রত মুখোপাধ্যায় 'আনন্দবাজার পত্রিকার' সাংবাদিক। সেবাব্রত'র বাবা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বেলডাঙার লেখক, সাংবাদিক তথা বুদ্ধিজীবী ব্যক্তি হয়ে আমাদের হৃদয়ে বিরাজ করছেন।

১৯৮৫ সাল থেকে প্রশান্ত দেবনাথের সম্পাদনায় 'শরতের ফুল' সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশ হতে শুরু করে। এই পত্রিকার সঙ্গে কোন সময় সভাপতি বা পৃষ্ঠপোষক রূপে আমি জড়িত ছিলাম। ক্রমান্বয়ে দশ বছর পর্যন্ত এই পত্রিকা প্রকাশ হয়েছিল। দশম সংখ্যার সম্পাদক ছিলেন বলরাম হালদার। শরতের ফুল সাহিত্য গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে সাহিত্য আলোচনা সভা বসত 'ফুলের জলসা' নামে। বীরভূমের অতনু বর্মন, মুক্তি মুখোপাধ্যায়, শ্রদ্ধেয় জননেতা অধ্যাপক রেজাউল করিম, সারগাছি রামকৃষ্ণ মিশনের দেবরাজনন্দ মহারাজের লেখা প্রকাশ হয়েছিল। 'ফুলের জলসা'য় সাংস্কৃতিক, সংগীত ও সাহিত্য অনুষ্ঠান হত।

১৯৮২ সালে বেলডাঙা অন্নপূর্ণা মন্দির কমিটি থেকে 'আগমণী' পত্রিকা শুরু করে। এছাড়াও ছুতোরপাড়া অগ্রগামী সংঘ, নেতাজি পার্ক, কলোনির তরুণ সংঘ প্রভৃতি স্থানেও দুর্গা পূজা উপলক্ষে পত্রিকা প্রকাশ হত।

১৯৮০ সালে বেলডাঙা থেকে 'সায়ক' পত্রিকা পথচলা শুরু করে। মুসলিম আলি, তন্ময় মৈত্র, কনিকা বিশ্বাস, প্রশান্ত দেবনাথ এই পত্রিকার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

১৯৯৫ সালে 'খোলা মন' নামে পাক্ষিক সংবাদ-সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশিত হত। মোঃ ইউসুফ, এম. এ. সবুর এই পত্রিকার সম্পাদনা করতেন। এই পত্রিকার কয়েক বছর পর পাক্ষিক সংবাদপত্র 'শানিত কলম' প্রকাশ হতে শুরু করে। ২০০৫-০৬ সালে 'সওগাত নবপর্যায়' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকার দুটির সম্পাদক ছিলেন এম. এ. সবুর। পরে 'শানিত কলম' পত্রিকার সম্পাদক হন আনোয়ারুল হক। ১৯৯০ এর দশকে আনোয়ারুল হকের সম্পাদনায় বেলডাঙা

থেকে ‘আলো’ নামে একটি সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশ হত। রাজকুমার শেখ এই পত্রিকার সহ-সম্পাদক ছিলেন।

হরেকনগর আব্দুল মোমেন ইনস্টিটিউশনের ছাত্র অবস্থায় রাজকুমার শেখ প্রধান শিক্ষক আব্দুল ওয়াসে, শিক্ষক মজিবুর রহমানের উৎসাহ ও সহযোগিতায় ১৯৮৭ সাল থেকে দেওয়াল পত্রিকা প্রকাশ শুরু করেছিল। বন্ধু রফিকুল ইসলাম সাহায্য করত।

বেলডাঙা মাঝপাড়া থেকে ‘নবারুণ’ নামে একটি ছোট পত্রিকা ১৯৯২ সালে রাজকুমার শেখের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রকাশ হয়েছিল। এই পত্রিকায় সম্পাদক ছিলেন প্রয়াত গল্পকার বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়। বেলডাঙা এস.আর.এফ. কলেজের প্রফেসর শ্রদ্ধেয় সনৎ করের পরামর্শ মত রাজকুমার শেখ বন্ধুসহ ইংরেজি মাসের শেষ শনিবার কলেজের নির্দিষ্ট ঘরে সাহিত্য আসর বসাত।

১৯৯৮ সাল থেকে রাজকুমার শেখের সম্পাদনায় ‘জমিন’ পত্রিকা প্রকাশ হয়। বেশ কয়েকটা সংখ্যা প্রকাশ হয়েছিল। আমি রূপক কুমার চট্টোপাধ্যায় ‘জমিন’ পত্রিকার পরিচালকমন্ডলীর সভাপতি ছিলাম। রাজকুমার শেখ পশ্চিম বাংলা ছাড়াও ত্রিপুরা ও বাংলাদেশের মাটিতে বহু প্রচারিত একজন জনপ্রিয় কথাশিল্পী।

১৯৯৭ সালে ফটোগ্রাফার ও সাংবাদিক সঞ্জীব প্রামানিকের সম্পাদনায় ‘কিরণ’ সাহিত্যধর্মী পত্রিকা পথ চলা শুরু করে। এই পত্রিকাও বেশ কয়েকটি সংখ্যা প্রকাশ হয়েছিল।

১৯৯০ সালে বেলডাঙা থেকে ‘মিরাজ’ নামে একটি সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশিত হত। আনোয়ার হোসেন ও মোহাম্মদ সাহাজামাল এই পত্রিকার যুগ্ম-সম্পাদক ছিলেন। সভাপতি ছিলেন ডাঃ আমিরুল ইসলাম।

শিক্ষারত্ন ও রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত বেলডাঙা দারুল হাদীস সিনিয়ার মাদ্রাসার অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক (Superintendent) শ্রদ্ধেয় নুরুল ইসলাম মিয়া একজন বিশিষ্ট সাহিত্য সেবক। এই মাদ্রাসা থেকে ‘প্রথম আলো’ ও ‘৭৫ বছরে আমরা’ নামে দুটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। তিনি বর্তমানে কবিতা, ছড়া, গল্প, বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক ও ইসলামী সাহিত্যে গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ লেখার সঙ্গে যুক্ত।

২০০৩ সালে বেলডাঙার সারগাছি থেকে শিশুকেন্দ্রিক সংবাদ-সাহিত্য পত্রিকা ‘খুঁজে আনা প্রতিভা’ প্রকাশ হত। সম্পাদক ছিলেন ওয়াহিদুজ্জামান রনি। পরে ২০১৬ সাল থেকে সুতিঘাটা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সাহিত্যপ্রেমী প্রধান শিক্ষক হিলাল উদ্দিনের সম্পাদনায় বিদ্যালয় থেকে এই পত্রিকাটি প্রকাশ হতে থাকে। নিজ বিদ্যালয় ছাড়াও অন্য বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের লেখা এবং অঙ্কনগুলি তিনি চার পাতার পত্রিকায় প্রকাশ করতেন। এছাড়াও এই বিদ্যালয়

থেকে ২০১৫ সালে 'কোরক' নামে বই আকারে বিভিন্ন তথ্য সহযোগে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। এই পত্রিকার সম্পাদক শিক্ষক সেলিম উর রহমান।

ষাটের দশকে দেবপুর গ্রামের সবুজ সংঘের উদ্যোগে মোঃ কাবাতুল্লা'র সম্পাদনায় হাতেলেখা পত্রিকা 'সবুজলিপি' প্রকাশিত হয়েছিল। পত্রিকাটি মাত্র দু-একটা সংখ্যা বের হয়েছিল। এই গ্রামের একজন সাংবাদিক ও লেখক মুজিবুর রহমান। পূর্বে তিনি 'আনন্দবাজার' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বর্তমানে তিনি লেখালেখি ও ফ্রিল্যান্স সাংবাদিকতার সঙ্গে যুক্ত আছেন।

গোবিন্দ সুন্দরী বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রয়াত শিক্ষক সন্তোষ রায়, অরুণ কুমার গাঙ্গুলী, অমল কৃষ্ণ ভাদুড়ী ও বিশ্বনাথ মণ্ডল প্রমুখের চেষ্টায় 'দ্বান্দিক' পত্রিকা প্রকাশিত হত।

হরেকনগরে ১৯৭৪ সালে শ্যামল সওদাগরের সম্পাদনায় সাপ্তাহিক সংবাদপত্র 'চলোর্মি' প্রকাশ হত। এই নামে বার্ষিক শারদ সংখ্যাও প্রকাশ হত। ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত পত্রিকাটি প্রকাশ হয়েছিল। 'সত্য মারা গেছে' শ্যামল সওদাগরের জনপ্রিয় লেখা। ইনি একজন সাংবাদিক ছিলেন।

২০১৬ সালে বেলডাঙা থেকে পাক্ষিক সংবাদপত্র 'কথাবার্তা' প্রকাশিত হত। এই পত্রিকা সম্পাদনায় ছিলেন কবিবুল ইসলাম কঙ্ক, দীননাথ মণ্ডল ও হিলাল উদ্দিন। প্রকাশক সাদিক ইকবাল।

বর্তমানে বেলডাঙায় চলমান সাহিত্য পত্রিকার রূপে 'কথাবার্তা' ও 'সোঁদামাটি' সগর্বে নদীর স্রোতের মতো সাহিত্য জগতে প্রবাহমান। এই পত্রিকা দুটির সম্পাদক হলেন দীননাথ মণ্ডল। 'কথাবার্তা' একটা গবেষণাধর্মী সাহিত্য পত্রিকা। ২০১৯ সালে 'কথাবার্তা' সাহিত্য পত্রিকা রূপে আত্মপ্রকাশ করে। 'সোঁদামাটি' ২০১৪ সালে প্রথম অনলাইন সাহিত্য পত্রিকা রূপে আত্মপ্রকাশ করে, পরের বছর থেকে মুদ্রিত আকারেও প্রকাশিত হতে থাকে। 'কথাবার্তা'র সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্যগণ হলেন রাজকুমার শেখ, মোঃ দাবিবুল ইসলাম ও মোঃ ইনজামাম হাবিব। দীননাথ মণ্ডল পত্রিকা সম্পাদনা ছাড়াও ছড়া, কবিতা, গল্প, তথ্য সাংবাদিক এবং আঞ্চলিক ইতিহাস বিষয়ক লেখালেখির সঙ্গে যুক্ত। 'সোঁদামাটি' মূলত সাহিত্যধর্মী যেমন— কবিতা, ছড়া, ছোটগল্প, প্রবন্ধ, রম্যরচনা, একাঙ্ক নাটক, ভ্রমণ কাহিনী বিষয়ক পত্রিকা।

বেলডাঙা সাহিত্য ও সংস্কৃতি জগতে দীর্ঘদিন ধরে গঙ্গা নদীর মতো প্রবাহমান পত্রিকার নাম 'পল্লব সন্দেশ'। ১৯৭৫ সালে প্রথম প্রকাশিত 'নবপল্লব' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন হরেকনগর এ. এম. ইনস্টিটিউশনের শিক্ষক আব্দুল ওয়াহেদ। পরে রেজিস্ট্রেশনের পর নাম হয় 'পল্লব সন্দেশ'। এর সম্পাদক হলেন বলরাম হালদার। এই পত্রিকায় মুর্শিদাবাদের ভূমিপুত্র স্বাধীনতা সংগ্রামী অধ্যাপক রেজাউল করিম, এশিয়াডে পদকজয়ী গোলাম কিবরিয়া, মস্কো অলিম্পিকে

ভারতীয় হকি দলের সদস্য মহুলার দিলীপ ঘোষ প্রমুখের সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়েছে। এই সাক্ষাৎকারে আমি ছিলাম। গোলাম কিবরিয়া হরেকনগর আব্দুল মোমেন ইনস্টিটিউশনের কৃতি ছাত্র ও ভারত বিখ্যাত দৌড়বীর। প্রথম প্রকাশক প্রয়াত গৌতম রায়। 'পল্লব সন্দেশ' পত্রিকার সভাপতি ছিলেন চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়। চন্দ্রশেখর ওরফে ডালিম ২০২২ সালে প্রয়াত হন। ডালিমের 'বার্লিনের প্রাচীর' জনপ্রিয় উপন্যাস। চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বাড়িতে সাহিত্য আসর বসাতেন।

বেলডাঙা থেকে 'এখন প্রতিচ্ছবি' নামে একটি কবিতা বিষয়ক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকার সম্পাদক কবিরুল ইসলাম কঙ্ক। এছাড়াও বেলডাঙার প্রসন্ন কুমার স্মৃতি পাঠাগার থেকে 'অনির্বাণ' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হত।

কবিগুরুর কথায়— "সাহিত্যের বিষয় হল মানব হৃদয় এবং মানব চরিত্র।" আমি একজন সাধারণ ব্যক্তিরূপে বিশাল বেলডাঙার সাহিত্য ভান্ডারে মানব হৃদয় ও মানব চরিত্রের সামান্য তুলে ধরলাম মাত্র। বেলডাঙার এরূপ অনেক সাহিত্য আছে, পত্রিকা আছে, যাদের নাম, পরিচয় এই অল্প পরিসরে স্থান পেল না, তার জন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী।

ছবি ঃ বেলডাঙা থেকে প্রকাশিত কয়েকটি পত্রপত্রিকা

লৌকিক প্রথা ঃ ব্যাঙের বিয়ে

সন্তোষ রঞ্জন দাস

বাংলায় ছয় ঋতু। পর্যায়ক্রমে গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত। শেষ ঋতু বসন্তের আগমনে পুরাতন জীর্ণ-বিবর্ণ পাতা ঝরে, নতুন পাতায় সজ্জিত হয় বনানী। লালে লাল হয়ে কৃষ্ণচূড়া-শিমুল-মাদার ফুটে। মেঠো পথের ধুলো কৃষ্ণচূড়া -শিমুল-মাদারের ঝরে পড়া ফুলে লালে লাল, ঋতু রানি বসন্ত সেনা পথের ধূলায় মুঠো মুঠো রক্তিম আবির ছড়িয়ে দেয়।

শাল গাছেও শুভ্র ফুলের আলপনা, সুগন্ধি সুবাসে আকাশ-বাতাসের মত্ততা। ফুলে ফুলে প্রজাপতির নাচন, ভ্রমরের গুন গুন, একাকী কোকিল সঙ্গিনীর প্রত্যাশায় পাতার আড়াল থেকে কুহু কুহু ডাক। অন্যান্য পাখিরাও কূজনে কূজনে দু'জনে জোড় বাঁধতে চেয়ে আনন্দে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে। প্রকৃতিতে ক্রন্দসী উৎসব। এ সময় ফাল্গুনী পূর্ণিমার চাঁদ ষোল কলা পূর্ণ করে।

রবীন্দ্রনাথের সোনার বাংলা, নজরুলের বাংলাদেশ, জীবনানন্দের রূপসী বাংলা'য় এর ঠিক বিপরীত চিত্র দেখা যায় গ্রীষ্ম ঋতুতে।

প্রচণ্ড গ্রীষ্মে মাটি ঝলসে ওঠে রোদের তাপে। পুড়ে যায় মাঠের ফসল, রোদে শুকোয় পুকুর-খাল-বিল। নিস্তব্ধ নিঝুম রোদ পোড়া দুপুর প্রখর গ্রীষ্মের চিত্র আঁকে। প্রকৃতি চাতক পাখির মত অপেক্ষায় থাকে, এক ফোঁটা বৃষ্টির জলের জন্য।

লোককবি পুলকেন্দু সিংহ আঞ্চলিক ভাষায় 'শুখা দেশের ভূকা মানুষ' কবিতায় লেখেন—

ডাঙ্গাল শুখা বিলেন শুখা
ভূকা গাঁয়ের কৃষানি রে
মাটির মায়ের বুক ফেটে যায়
কে মিটাবে তিষা রে।
সেচন বাগরে বিচন গেলরে
বিচলি পায়না বলদা রে
আষাঢ় মাসে ফাগনের হাওয়া
বিধির কেমন বিধান রে।
ব্যাঙের বিহা হলরে কত না
তাও মিলে না পানিরে
ডাঙ্গাল শুখা বিলেন শুখা
ভূখা গাঁয়ের কিশানি রে। (তারিখ : ১৩-৭-১৯৮২)

পল্লী বাংলায় শুরু হয় বৃষ্টিকে আহবান করে নানা লৌকিক প্রথা। এমনি একটা লৌকিক প্রথা 'ব্যাঙের বিয়ে'। কতদিন পূর্বে 'ব্যাঙের বিয়ে' প্রথার উৎপত্তি তা অজ্ঞাত। নিরক্ষর গ্রামীণ মহিলারাই এর স্রষ্টা, শ্রুতি নির্ভর। তাই আদি যুগের ব্যাঙের বিয়ের ছড়া পাওয়া যায় না। পূর্বে প্রতি বছর নতুন নতুন পদ সৃষ্টি হত। এখন ব্যাঙের বিয়েও হয় না, পদ সৃষ্টি হয় না।

গ্রামের প্রবীণা মহিলারা মিলে ঠিক করেন, এবার বৃষ্টি আনতে ব্যাঙের বিয়ে দিতে হবে। তা শুনে বাচ্চা ছেলে-মেয়েরা লাফিয়ে ওঠে। বিয়ের দিন ঠিক করে শুরু হল তোড়জোড়। কেউ আনে কুলো, কেউ আনে ধামা, কেউ কেউ আনে কাঁচা হলুদ, তেল, সিন্দুর। আবার পুরোহিত বাড়ি থেকে এল নামাবলি। এবার আসল কাজ, জোগাড় করতে হবে 'ব্যাঙবর' আর 'ব্যাঙকনে'।

সন্ধ্যা রাতে সেই কাজে নেমে পড়ত গ্রামের ছেলে-মেয়েরা। অনেক ব্যাঙ ধরা হত। গ্রামের একজন প্রবীণা ঠিক করে দিতেন কোন ব্যাঙ জোড়া নেওয়া হবে। নির্বাচিত বর-কনে কোলাব্যাঙ নিয়ে শুরু হত বিয়ের অনুষ্ঠান। বর্তমানে কোলাব্যাঙ দেখা যায় না। এই ব্যাঙ প্রায় বিলুপ্তের পথে।

পরের দিন অর্থাৎ বিয়ের দিন ব্যাঙ বর-কনেকে তেল-হলুদ মাখিয়ে স্নান করানো হয়। তারপর কনে ব্যাঙটাকে কপালে সিঁদুরের টিপ দিয়ে নামাবলি মুড়ে ধামায় বসানো হয়। বর ব্যাঙটাকেও নামাবলি জড়ানো হয়। এরপর ব্যাঙ বর-কনে দু'জনকেই ধামায় করে মাথায় নিয়ে বেরোনো হয় গ্রাম-পরিক্রমায়। শুরু হয় মেঘ রাজার কাছে জল চেয়ে 'ব্যাঙের বিয়ের গান'।

গান ঃ ১

"আল্লার বান্দা গুনাগার পুড়ে হল ছারখার
আল্লাহ মেঘের পানিদেরে, পানি দেরে আল্লাহ তুই
কোদুর ভুঁইয়ে ছিপ ছিপানি— ধানের ভুঁইয়ে হাটু পানি
দেরে পানি আল্লা ওরে মেঘের পানি দেরে তুই
শীতল কর তুই জমিন আসমান, মেঘের পানি দিয়া রে।।"

(প্রচলিত)

গান ঃ ২

"ব্যাঙ্গা-ব্যাঙ্গির বিয়া, কুলো মাথায় দিয়া,
ও ব্যাঙ পানি আন গিয়া,
খালেতে নাই পানি
বিলেতে নাই পানি
আসমান ভাঙ্গি পড়ে ফোঁটা ফোঁটা পানি।"

(পূর্ববঙ্গের দিনাজপুর অঞ্চলে প্রচলিত)

ব্যাঙ বর-কনে নিয়ে ব্যাঙের বিয়ের গান সহ গ্রাম-পরিক্রমায় বিভিন্ন বাড়ি থেকে ফল-মূল, চাল-ডাল-সবজি-অর্থ উপহার দেওয়া হত। ছেলে-মেয়েরা বাড়ি বাড়ি ঘুরে ব্যাঙের বিয়ের ভোজের উপকরণ সংগ্রহ করে, সন্ধ্যায় গ্রাম সংলগ্ন মাঠে কিংবা বড়ো কোন গাছ তলায় সংগৃহীত সামগ্রী দিয়ে বিয়ের ভোজে মেতে উঠত। ভোজের আয়োজন চলাকালীন ও চলত ব্যাঙের বিয়ের গান।

গত শতকে বেলডাঙা মাঝপাড়া গ্রামের মুসলিম ছেলে-মেয়েরা বৃষ্টিকে আহ্বান জানিয়ে 'ব্যাঙের বিয়ে' দিত। এক্ষেত্রে ব্যাঙের বিয়ের অনুষ্ঠানের ভিন্নরূপ ছিল। গ্রামের প্রাচীন পাকুড়গাছের নীচে ছোট্ট গর্ত কেটে জল ঢেলে পুকুর বানানো হত, এই পুকুরে একজোড়া ব্যাঙের গায়ে লাল কাড় বেঁধে ঐ পুকুরে ছাড়া হত। তারপর বাবা মায়ের একমাত্র অবিবাহিত কন্যাকে নির্বাচন করে ঐ পুকুরের পাড়ে নির্বাচিত কন্যা নিজের মাথায় বাঁশের চালুনি মাথায় ধরে দাঁড়াত, আগে থেকে সংগ্রহ করে রাখা পান্তা ভাতের জল বা আমানি চালুনিতে ঢেলে তাকে স্নান করানো হত। সমবেত কণ্ঠে ছেলে-মেয়েরা ব্যাঙের বিয়ের গান গাইত।

পল্লী বাংলার প্রাচীন ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রেখেছিল বিংশ শতক। কিন্তু একবিংশ শতকে বিশ্বায়নের শহুরে সংস্কৃতির আগ্রাসনে গ্রামীণ লৌকিক প্রথা, লোকগান, ছড়া, ধাঁধা, লোকপার্বণ পল্লী জীবনে আর দেখা যায় না। লৌকিক সংস্কৃতি বিলুপ্তির পথে!

বাংলার প্রচলিত লোকপুরাণ

লোকেশ চন্দ্র বিশ্বাস

বিশ্বচরাচরের অসংখ্য বিষয়ে প্রকৃত উপলক্ষ সম্পর্কে আদিম কাল থেকেই মানুষের মনের মধ্যে নানা প্রশ্নের সৃষ্টি হয়েছে- সেইসব অজস্র 'কেন'র উত্তর খুঁজতে মানুষ নানা ধরনের সংস্কার ও বিশ্বাস মণ্ডিত যেসব ব্যাখ্যা কল্পনা করে এসেছে, সেগুলি কাহিনীর রূপে সংগঠিত হয়ে সৃষ্টি হয়েছিল লোকপুরাণে। তাই লোকপুরাণ বা মিথ হল মানুষের আদিমতম সাহিত্য।

লোকপুরাণের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে স্যার জি. এল. গোম লিখেছেন— "Myth is the science of a pre-scientific age." আমাদের চারিদিকে "যেসব প্রাকৃতিক ঘটনা ঘটছে তার উত্তর খোঁজার প্রথম সৃষ্টি বিষয়ক লোকপুরাণকে তাই মানবজাতির শৈশবাবস্থার জিজ্ঞাসার প্রতিচ্ছবি রূপে গ্রহণ করা চলে।"

লোকপুরাণকে ইংরেজিতে বলে 'Myth', শব্দটি এসেছে গ্রিক শব্দ 'Muthos' থেকে।

লোকপুরাণে দেবতা, ধর্মভাবনা, ধর্মাচার (অর্থাৎ রিচুয়ান) ইত্যাদি সঙ্গে অনিবার্য ও অবিচ্ছেদ সম্পর্ক তৈরি হয়েছে। কারণ তৎকালীন পারিবেশিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে সংগতি রেখেই সহজাত সংস্কারের তাদের ধর্ম বিশ্বাস ও দৈবনির্ভরতার সঙ্গে এগুলিকে সংশ্লিষ্ট করে ব্যাখ্যা ও কাহিনী সৃষ্টি করেছে। যেখানে দেবতা আসেনি, সেখানেও ওই একই মানসিকতার কারণে এক ধরনের ধর্মীয় মাহাত্ম্য কল্পনা করা হয়েছে।

অনেকে আবার কিংবদন্তিকেও এক ধরনের মিথ্ মনে করেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে, অনেক কিংবদন্তিতে মিথ্ বা লোকপুরাণের আমেজ থাকতে পারে কিন্তু কিংবদন্তিতে যে আখ্যান বর্ণিত হয় নির্দিষ্ট জায়গায় সংগঠিত হয়েছিল বা হতে পারে বলে এলাকার মানুষজন বিশ্বাস করেন। লোকপুরাণে এ সব প্রশ্ন ওঠে না। অনাবিল আনন্দে মানুষ তার গল্পরস আস্বাদন করে। লোকপুরাণে কল্পকথার অতিলৌকিক স্তরের পরে যখন বাস্তব কিছু ইতিহাসবোধ সমাজে দানা বাঁধতে শুরু করেছে তখনই কিংবদন্তির জন্ম।

লোকপুরাণকে যতই অবাস্তব, অলৌকিক বা অসম্ভাব্য বলে মনে হোক না কেন, তারই গভীরে লুকিয়ে থাকে বাস্তব অভিজ্ঞানের রেনু আর বাস্তবের একান্ত স্পর্শ থাকে বলেই সময়ের বিবর্তনে মিথের রূপ পরিবর্তিত হলেও তার প্রত্ন কাঠামোটি একই থাকে। বাংলার প্রচলিত মিথ্—

এক গোবুর এক পাটি দাঁত ঃ কৃষ্ণ তিনদিন দিন রাত ধরে একটানা মাঠে

গোরু চড়িয়ে, বাড়ি ফিরে গোরুর পাল যখন গোয়ালে ঢোকাছিল, তখন একটা গোরু গোয়াল ঘরের চালের খড় টেনে চিবাতে শুরু করে। তা দেখে কৃষ্ণ প্রচণ্ড রেগে গিয়ে পায়ে 'বাদাড়ি' (কাঠের খরমের মতো পাদুকা) দিয়ে সেই গোরুটার মুখে আঘাত করে। সেই আঘাতে গোরুর উপরে পাটির দাঁত পড়ে যায়। সেই থেকে গোরুর এক পাটি দাঁত।

গোরু কেন চাষ করে ঃ শিব নন্দীকে পাঠিয়েছে মর্তে, মর্তবাসিকে জানাতে যে তারা দিনে তিনবার নাম গান করবে ভগবানের আর একবার খাবে। নন্দী মর্তে এসে সেই কথা ভুলে গেল, সে মর্তবাসীদের বলল তিনবার দিনে খাবে আর একবার ভগবানের নাম গান করবে। কৈলাসে ফিরে শিবের প্রশ্নের উত্তরে সেই কথা বলল। শিব রেগে আগুন। মর্তের মানুষ তিনবার খেলে অত খাবার পাবে কোথায়! তাহলে নন্দীকে মর্তে গিয়ে খাবার উৎপাদন করতে চাষীদের সাহায্য করতে হবে।

নন্দী হল গোরুর আদিপুরুষ, সে কিছুতেই মর্তে আসবে না। তখন দেবতারা নন্দীকে আশ্বস্ত করল, তোমার উপর আঘাত, অত্যাচার তোমার দেহে অবস্থান করে, তা আমরাই সহ্য করব। তোমার কষ্ট আমরা ভাগ করে নেব।

তখন নন্দী মর্তে এসে গোরু হয়ে হাল বয়তে শুরু করল। সে খাদ্য উৎপাদনের প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করল। দেহে দেবতাদের অবস্থান থাকায় গোরু হিন্দুদের কাছে পবিত্র প্রাণীতে পরিণত হল।

গ্রহণ লাগা ঃ সমুদ্র মন্থনের অমৃত উঠেছে। নারায়ণ মহিনীর মূর্তি ধারণ করে অমৃত ভাণ্ড নিয়ে ভাগ করতে লাগল। দেবতারা এক পংক্তিতেতে আর দানবরা বসল আর এক পংক্তিতে। কিন্তু রাহু ও কেতু নামক দুই দানব দেবতা রূপ ধারণ করেই দেবতাদের পংক্তিতে বসেছিল। মোহিনী রূপী নারায়ণ সর্বপ্রথমে অমৃত দেবতাদের পংক্তিতে পরিবেশন করতে লাগল। দেবতা রূপী রাহু ও কেতুর পাতে অমৃত দেওয়ার সঙ্গো সঙ্গো গলাধঃকরণ করে নিল। সেই মুহূর্তে চন্দ্র সূর্য রাহু কেতুকে চিনে ফেলে নারায়ণকে বলে দেয়। নারায়ণ তৎক্ষণাৎ সুদর্শন চক্র দিয়ে তাদের গলা কেটে দেহ থেকে মুন্ডু আলাদা করে দেয়।

যতদূর অমৃত প্রবেশ করে অর্থাৎ মুখ, মাথা ও গলা অমরত্ব লাভ করল। চন্দ্র, সূর্য যেহেতু দেবতা রূপী রাহু কেতুকে চিনিয়ে দেয়, তাই তাদের রাগ চন্দ্র সূর্যের উপরে। তাই মাঝে মাঝে রেগে রাহু ও কেতু চন্দ্র সূর্যকে গিলে খায়। গলার সঙ্গো দেহ থাকায় চন্দ্র সূর্য বেরিয়ে আসে। গিলে খাওয়ার পর চন্দ্র সূর্যকে কিছুক্ষণ দেখা যায় না। সেই সময়টাকেই গ্রহণ বলে।

গ্রহনের সময় খাদ্য বস্তুর উপর কাঁটা পাতা সহ সরুসরু ডাল রেখে দেয়, যাতে রাহু কেতু খাদ্যবস্ত খেয়ে নিতে না পারে।

নতুন কাপড়ের সূতা দান ঃ এখনো গ্রাম বাংলার প্রবীণ মানুষরা নতুন কাপড় পরিধানের পূর্বে কাপড়ের আঁচলের সূতা তুলসী গাছের উপর দিয়ে প্রণাম করে। তাছাড়া সেই কাপড়ের এক প্রান্তের সামান্য অংশ আগুন দিয়ে পুড়িয়ে নেয়। পোড়ানোর উদ্দেশ্য হল কেউ যাদুক্রিয়া বা তুকতাক করতে পারবে না।

তুলসী গাছের সূতা দানের পিছনে লোকপুরাণ আছে— কৌরব রাজসভায় পাশা খেলায় পাণ্ডবরা হেরে যাওয়ায়, বাজি ধরা দ্রৌপদীকে দুঃশাসন সর্বসম্মুখে বস্ত্র হরণের চেষ্টা করছিল। সেই সময় দ্রৌপদী কায়মন বাক্যে কৃষ্ণের স্মরণ নেয়। কৃষ্ণ তাঁকে প্রশ্ন করে, তুমি কি কাউকে কোনদিন বস্ত্র দান করেছ? দ্রৌপদী তার উত্তরে বলেন— নদীতে স্নান করতে গিয়ে এক ঋষির কোপীন হারিয়ে যায়, সেই ঋষির লজ্জা নিবারণের জন্য আঁচলের কিছু অংশ ছিঁড়ে দিয়েছিলাম। কৃষ্ণ বলেন— তুমি বিবস্ত্র হবে না, অন্তরীক্ষ থেকে তিনি দ্রৌপদীকে বস্ত্র সরবরাহ করতে থাকে। দুঃশাসন শত চেষ্টা করে দ্রোপদীকে বিবস্ত্র করতে পারেনি। তুলসীকে নতুন কাপড়ের সূতা দানের মাধ্যমে বস্ত্রহীন না হওয়ার প্রার্থনা করে।

কোজাগরী পূর্ণিমায় আলো জ্বালিয়ে বাড়িতে জেগে থাকা ঃ 'কোজাগরী' শব্দটির উৎপত্তি 'কো জাগতী' অর্থাৎ 'কে জেগে আছ' কথাটি থেকে। বলা হয় 'যার কিছু সম্পত্তি নেই, সে পাওয়ার আশায় জাগে, আর যার আছে (সম্পত্তি) সে না হারানোর আশায় জাগে'। বাংলার গ্রামীণ মানুষের বিশ্বাস এই রাতে লক্ষ্মী দেবী গ্রামে ঘুরে বেড়ায়। যে বাড়ির গৃহিনী বাড়ির দুয়ারে আলো জ্বালিয়ে বসে থাকে সেই বাড়িতে প্রবেশ করে। কোজাগরী পূর্ণিমার রাতে আকাশ মেঘমুক্ত পরিষ্কার থাকলে রবিশস্য ভালো হয়। লোক বিশ্বাস।

দূর্বা ঘাসের জন্ম ও পবিত্রতা ঃ সমুদ্র মন্থনের সময় বিষ্ণু নিজ বাহু ও জঙ্ঘার দ্বারা মন্দর পর্বতকে ধারণ করে। ওই সময় মন্দর পর্বতের সঙ্গে ঘর্ষণের ফলে বিষ্ণুর দেহের লোমগুলি খসে খসে সমুদ্রের জলে পড়ে। এবং ঢেউয়ে ভেসে ভেসে তীরে এসে পৌঁছায়। পরে সেই লোমগুলি দুর্বা হয়ে পৃথিবীতে জন্মায়।

সমুদ্র মন্থন করে দেব অসুররা যখন অমৃত সংগ্রহ করছিল তখন কয়েক ফোঁটা অমৃত দুর্বার উপর পড়ে। ফলে দুর্বা আজও অমর ও পবিত্র। সেই থেকে দুর্বা দেবতাদের প্রিয় হল।

তুরি মেরে মল মূত্রত্যাগ ঃ একসময় গ্রামীণ মানুষ খোলা জায়গায় ঝোড়ে জঙ্গালে মল মূত্র ত্যাগ করত। বাড়িতে কোন পায়খানার ব্যবস্থা ছিল না। হয়তো এখনো ওই অভ্যাস গ্রামের মানুষের থাকতে পারে। পূর্বে গ্রামের মানুষদের মধ্যে অনেকে খোলা জায়গায় বা ঝোপে ঝাড়ে মলত্যাগের পূর্বে তুড়ি মেরে তবে মলত্যাগে বসত। এর পিছনে একটি লোকপুরাণ আছে— কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পাক-মুহূর্তে অর্জুনকে কৃষ্ণ বিশ্ব দর্শন করান। পাণ্ডবরা জানলে জগতের সর্বত্র কৃষ্ণ বিরাজমান। মধ্যপাণ্ডব ভীমের মাথায় বিষয়টি ঢুকে গেল। ভীম শরীরে বলশালী কিন্তু মস্তিষ্কে নয়। তাই তিনি ভাবলেন, যেখানেই মলমূত্রত্যাগ করি না কেন, সেখানেই কৃষ্ণ বর্তমান। তাই তিনি মল মূত্রত্যাগ করা বন্ধ করে দিল। কিছুকাল পরে ভীমের দুর্গন্ধ বের হতে লাগল। ফলে সে লোকালয়ের বাইরে থাকতে লাগল। কৃষ্ণ বিশেষ কারণে ভীমের কাছে যান এবং দুর্গন্ধ নাকে আসে। কৃষ্ণ ভীমকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারল, সে দীর্ঘকাল মলমূত্র ত্যাগ করেনি, সর্বত্র কৃষ্ণের উপস্থিতিতে। কৃষ্ণ ভীমের বুদ্ধিমত্তা ও মানসিকতা বুঝতেন। তাই তিনি ভীমকে বললেন— মলত্যাগের বসার আগে তিনবার তুড়ি দিলে, সেথা থেকে আমি সরে যাব। তুমি আরামে মল ত্যাগ করবে। সেই লোকপুরাণ থেকে গ্রামীণ জীবনে মলত্যাগ বসার আগে তিনতুড়ির দেওয়ার অভ্যাস প্রচলন হয়।

বুড়ির সুতো ঃ চাঁদের মাঝে কালো মতো অংশকে পাক্-সভ্যতার যুগের মানুষ কল্পনা করেছে— চাঁদের বুড়ি ওখানে বসে সুতো কাটছে। গ্রামবাংলায় ঝোপঝাড়ের মাথায় সরু সাদা সুতোর জাল বা বাতাসে সরু সুতোর মত পিণ্ড ভেসে যেতে দেখা যায়। লোকমুখে শোনা যায়, বুড়ি চাঁদে যে সুতো কাটছে, সেই সুতো ভেসে গ্রামে বাতাসে উড়ে বেড়াচ্ছে।

বিজ্ঞানের আলোকে দেখলে- চাঁদের কালো অংশ চাঁদের কলঙ্ক। চাঁদের নিজস্ব আলো নেই। সূর্যের আলো চাঁদে পতিত হয়ে, তা পতিত প্রতিফলিত হয়ে পৃথিবীতে আসে, তাই আমরা চাঁদকে দেখি। চাঁদের মধ্যে কিছু গহ্বর আছে, যেখানে সূর্যের আলো পৌঁছায় না। তাই আমরা কালো দেখি। সেটাকে বুড়ির চরকা কাটা কল্পনা করা হয়। বুড়ির সুতো হল chemwebs অর্থাৎ মাকড়সার সিল্ক। মাকড়সার উদরের নীচে রেচনগ্রন্থি থেকে সুতোর সৃষ্টি হয়, তাই গ্রন্থিকে সিল্ক গ্ল্যান্ড বলে। মাকড়সার নিজেদের চলাচল, শিকার করার জন্য রেচনগ্রন্থির রস দিয়ে জাল বুনে। এই জালে এক ধরনের চটচটে স্থিতিস্থাপক ভাব থাকে। কত জাল একত্র দলা পাকিয়ে আকাশে ভেসে যায়।

উটের কুঁজ সৃষ্টি ঃ মুসলিম সমাজে এই লোকপুরাণের প্রচলন পাওয়া

গেছে। লোকপুরাণ অনুসারে পূর্বে উটের পিঠে কুঁজ ছিল না। আরবের এক মৌলবী বাস করতেন। তিনি অসম্ভব কৃপণ ছিলেন। একবার তাঁর ছেলে দোকান থেকে সরষে তেল আনার সময়, তা মাটিতে পড়ে যায়। মৌলবী তা শুনে, সেই স্থানে গিয়ে সেখানকার মাটি খুঁড়ে তুলতে লাগল। যতদূর পর্যন্ত মাটি তেল শুষে নিয়েছে, তত দূরের মাটি তুলে নিংড়ে মাটি থেকে তেল বের করে নেয়। এতে মাটি ও মাটির দেবতার প্রচণ্ড রাগ হল মৌলবীর উপর। একটু তেল পড়েছে তাও নিংড়ে বের করে নিল। মৌলবীকে স্বপ্ন দিল— তুই মরলে তোকে মাটিতে কবর দেবে। তখন তোর রস নিংড়ে বের করব।

স্বপ্ন দেখার পর তাঁর ছেলেদের বলল— আমার মৃত্যুর পর আমাকে মাটিতে কবর দেবে না। মৌলবীর মৃত্যুর পর নির্দেশ মতো তাঁর ছেলেরা তাদের বাড়ির পোষ্য উটের পিঠ কেটে সেখানে তাদের বাবাকে কবর দেয়। সেই থেকে উটের পিঠ উঁচু হয়ে কুঁজের সৃষ্টি হয়।

বৈশাখে কুমোরের চাক বন্ধ ঃ কুমোররা চৈত্র সংক্রান্তি দিন থেকে বৈশাখ সংক্রান্তি চাকা বা চাক ঘুরিয়ে কোন মাটির পাত্র তৈরি করে না। অর্থাৎ চাক ঘোরায় না। অনেক জায়গায় চাক তুলে রাখে। এর পিছনে একটি লোক কাহিনী বা লোকপুরাণ প্রচলিত —

ভস্মাসুর শিবের আরাধনায় নিজেকে উৎসর্গ করে, শিব সন্তুষ্ট হয়ে তাকে বর দান করে যে, সে যার মাথায় হাত দেবে সেই ভৎস হয়ে যাবে। ভস্মাসুর বর পাওয়ার পর বরের শক্তি পরীক্ষার জন্য শিবের মাথায় হাত দিতে চেয়েছিল। তখন শিব প্রাণভয়ে পালিয়ে গিয়ে কুমোরের চাকের তলায় লুকিয়ে যান। সেই দিনটি ছিল চৈত্র সংক্রান্তি, তাই কুমোররা চাক বন্ধ রাখে।

দেবতারা বেশ কিছুদিন শিবকে খুঁজে না পাওয়ায় ধ্যান যোগে জানতে পারে আসল ঘটনা। তখন দেবতারা যুক্তি করে বিষ্ণুর শরণাপন্ন হল। বিষ্ণু মোহিনী মূর্তি ধারণ করে ভস্মাসুরের কাছে গেল। ভস্মাসুর মোহিনী রূপে বিমোহিত হয়ে গেল। মোহিনীকে আলিঙ্গান করতে উদ্যত হল। মোহিনী কৌশলে ভস্মাসুরের হাত, তার নিজ মাথায় দেবার শর্ত আরোপ করল। নারী মোহে বিভোর হয়ে নিজের হাত নিজের মাথায় দিয়ে ভস্মাসুর ভস্ম হয়ে গেল।

শিব চাকে অবস্থান করছিল বলে, সারা বৈশাখ মাস চাক বন্ধ রাখে। চাকের মাঝে মাটি দিয়ে শিবলিঙ্গা তৈরি করে, সারা বৈশাখ ফুল বেল পাতা দিয়ে পূজা করে। বৈশাখের সংক্রান্তির দিন বিশেষ পূজা করে মাটির শিবলিঙ্গাটি জলে বিসর্জন দেয়। তাই বৈশাখ মাস চাক বন্ধ থাকে।

বিষহীন দাঁড়াশ সংক্রান্ত লোকপুরাণ ঃ মা মনসা একাধিকবার দাঁড়াশ সাপকে বিষদান করেছিলেন। প্রতিবারই দাঁড়াশ একটা করে ভুল করছিল— দাঁড়াশ সাপ বিষ গাছের কোটরে রেখে পাখি শিকার করতে যেত। আর অন্য কেউ এসে সেই বিষ খেয়ে যেত। ফলে বিরক্ত হয়ে মা মনসা দাঁড়াশকে অভিশাপ দেয়, চিরদিন বিষ বিহীন হয়ে থাকবে, তোকে কেউ ভয় করবে না, তুইই মানুষকে ভয় পাবি। দাঁড়াশ কাউকে দংশন করে না।

দিকচক্রাবল ঃ মাঠের দিকে তাকালে মনে হয় আকাশ মাটিতে এসে মিশেছে যাকে দিকচক্রাবল বলে। এক সময় পৃথিবীতে সেরকম মানুষজন ছিল না, শুধু এক বুড়ি বাস করত। তখন আকাশ খুব নীচে ছিল, মাটির কাছাকাছি। আকাশের সাথে মাটির মিতালী ছিল। বুড়ি সকাল বেলায় উঠান ঝাট দেবার সময়, একদিন বারবার পিঠে আকাশ ঠেকে যাচ্ছিল। সেদিন আকাশটা বেশি নীচে নেমে এসেছিল। বুড়ি বিরক্ত হয়ে আকাশের গায়ে ঝাঁটার বারি মারে। সে থেকে আকাশ অনেক উপরে উঠে গেছে। কিন্তু মাটির বন্ধুত্বের টানে মাঠের দিকে বা দূরে আকাশ নীচে নেমে আসে। কিন্তু মানুষ কাছাকাছি আসতে দেখলে উপরে উঠে যায়। তাই দূরের আকাশকে মাটির কাছাকাছি দেখি।

সাপের ফনায় কালো চিহ্ন ঃ কোবরা জাতীয় সাপের ফনার পিছনে কালো রঙে ইংরাজি ইউ (U) আকৃতি চিহ্ন থাকে। লোকপুরাণে বলা হয়— বৃন্দাবনের কাছে কালিদহের জলে কালীয়া সাপ বিষ ত্যাগ করে। সেই জল খেয়ে নব লক্ষ ধেনু ও কৃষ্ন সখারা অচৈতন্য হয়ে পড়ে।

কৃষ্ন তখন কালীয়া দমন করতে কালিদহে নামে। সাপ কূলের মৃত্যু হতে থাকে। একটি বাচ্চা সাপ ভয় পেয়ে কৃষ্নের পাদুকা (খড়ম) তলে আশ্রয় নেয়। কৃষ্ন আশ্রিতকে রক্ষা করে, কিন্তু মাথায় খড়মের দাগ থেকে যায়।

ভূমিকম্প সৃষ্টি ঃ ভূমিকম্পের কারণ ব্যাখ্যা করেছে প্রাচীন মানুষরা নিজেদের কল্পনা অনুসারে। সৃষ্টি হয়েছে একটি লোকপুরাণ। বাসুকি নাগের মাথায় পৃথিবী আছে অর্থাৎ বাসুকি নাগ মাথায় করে পৃথিবীকে ধারণ করে আছে। যখন সাপের মাথা নড়ে যায়, তখন পৃথিবী কেঁপে ওঠে অর্থাৎ ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়।

তথ্যসূত্র ঃ ক্ষেত্র সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্য।

রম্যরচনা

কাঠবিড়ালির পত্র নেউলকে

দিলীপ কুমার মধু

বন্ধু নেলু,

রাগ করো না, তোমার নামকে বিকৃত করলাম। জানোই তো বর্তমান যুগের সমস্ত কিছুই বিকৃত হচ্ছে। শুধু তোমার নয়, আমার নামও তো বিকৃত করলাম। কাঠু— বেশ ভালো। বলো। বেশ এবার একটু হাসো। কি হাসবে না। তবে এটা কেবল তোমার একার জন্য নয়। আরো অনেক বিষয়ের জন্য। বোম্বাই এখন মুম্বাই, পন্ডিচেরি এখন পুদুচেরি, মাদ্রাজ হয়েছে চেন্নাই, ব্যাঙ্গালোর থেকে বেঙ্গালুরু, ক্যালকাটা হয়েছে কলকাতা আর পশ্চিমবঙ্গ নাকি বঙ্গ না বাংলা। ভাবো! ভাবতে ভাবতে অবাক হবে। নয়তো অজ্ঞান হবে, নয়তো বউয়ের সঙ্গে ঝগড়া করবে, নয়তো চায়ের কাপে পাইপ লাগিয়ে চুমুক দেবে। নয়তো পরের টিকিতে হাত বুলিয়ে মন্ত্র জপ করবে। আর নয়তো নিজের কানের দিকে তাকিয়ে ঘুরপাক খেয়ে মাটিতে পড়বে। তবে কিছু যে একটা করবে তাতে সন্দেহ নেই। এবার রাগ কমলো তো। বাঃ।

তারপর শোনো। কেন এ পত্র লিখছি— জাস্ট এ মিনিট বন্ধু। মোবাইলটা টিনাং টিনাং করে বেজে উঠল। হ্যালো— আমি কাঠু বলছি, হ্যাঁ হ্যাঁ.. না না.. ও হো হো হো বলবে তো.. না না আমি নেলুর কাছে পত্র লিখছি। কি নেলুকে চেনো না। সে কি? আরে আমাদের জঙ্গলমহলের নেলু। সুপারস্টার নেলু। কি আপদ। আরে শোনো আমাদের স্বজাতি ভাই নেউল। এবার বুঝেছো। বেশ বেশ। তা ফোন করলে কেন? এমনি ফোন করলে। আই মিন হবি মানে শখ করে। শখ করে ফোন করে ঢক করে আমার সর্বনাশটি করলে। না না, তোমাকে কিছু বলিনি। বলছি কি মাঝে মাঝে এসো জ্বালাতে। ভালো থেকো, বাই..

ও হ্যাঁ শোনো, একটা মার্কা মারা লোক ফোন করেছে। মোবাইলের সংখ্যা যেভাবে বাড়ছে তাতে এমন কাণ্ড হবে তাতে সন্দেহ কি! যাক ওসব। তারপর শোনো— কেন এ পত্র লিখছি। গতকাল রাতে এক কাণ্ড ঘটেছে। আমি খাটিয়ার তলায় ঘুমিয়ে ছিলাম। গভীর রাত। হঠাৎ টের পেলাম কে যেন আমার শরীরে হাত বোলাচ্ছে। টানাটানি করছে। সভয়ে চমকে উঠলাম। ঘুম জড়ানো

চোখে দেখি কতগুলো রংবেরঙের মানুষ দাঁড়িয়ে আছে আমার সামনে। শুধু দাঁড়িয়েই আছে। রংয়ের খেলা যেন। আমি কি করি, কি করি। তখন তাদেরই মধ্যে থেকে একজন তার পরিচয় দিয়ে বললেন— তিনি স্বর্গের দেবরাজ ইন্দ্র। আর যারা আশেপাশে বিভিন্ন সাজে দাঁড়িয়ে আছেন তারা স্বর্গের দেব দেবীগণ। শুনে আর দেখে আমি তো আত্মহারা। দেবরাজ ইন্দ্র অভয় দিয়ে বললেন— তোমার কোন ভয় নেই। আমরা স্বর্গ থেকে এসেছি তোমার কাছে। সপরিবারে। স্বর্গ থেকে আমরা ভোট করছি তাতে মর্ত্য থেকে একমাত্র প্রাণী তুমি উপযুক্ত বলে আমরা নির্বাচন করেছি। তাই তোমাকে আমরা বিজয়ী বলে ঘোষণা করছি। তোমাকে আমরা আমাদের প্রতিনিধি স্বরূপ মন্ত্রী বানাতে চাই। তুমি আমাদের হতাশ করো না প্লিজ।

দেবরাজ ইন্দ্র আরো বললেন— আমরা জানি তুমি আমাদের ফেরাবে না। সেই সঙ্গো আরো যারা ছিলেন দেব দেবীগণ সবাই সমস্বরে এমন চিৎকার শুরু করলো যে আমি নিজেই নিজেকে হারিয়ে ফেলেছি যেন। কার কথা শুনবো, কার কথা শুনবো না। শেষমেষ দুকানে আঙ্গুল দিয়ে চুপ করে বসে রইলাম আর অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম।

আমার ঘুম তো দূরের কথা সমস্ত শরীর ঘাম ঝরছে। মৃদু মৃদু গা কাঁপুনি শুরু হয়েছে। আমার সে দৃশ্য দেখে ইন্দ্র বললেন— ভয় পাচ্ছ কেন? তোমার কোনো ভয় নেই। তোমাকে সব বিষয়ে পারদর্শী করে তোলার জন্য স্বর্গ থেকে নর্তকীদের এনেছি। ওরাই তোমাকে সব কিছু জানিয়ে বুঝিয়ে দেবে। তুমি নিশ্চয়ই ওদের সম্পর্কে জানো। নর্তকী মানে অপ্সরা। নিশ্চিত ছবিও দেখেছো। ওরাই তোমাকে সব কিছু দেখাবে। কয়েকদিনের মধ্যেই তুমি রসিক ভান্ডার হয়ে উঠবে। ওরাই তোমাকে নাচ, গান, বক্তৃতা দেওয়া, প্রতিশ্রুতি দেওয়া সব শেখাবে, সব। তুমি তখন আমাদের ভুলে যাবে। তুমি তখন পন্ডিত, বিজ্ঞ হয়ে উঠবে। বিচক্ষণ মানুষ হয়ে উঠবে। আজ আমরা যেমন সদল বলে তোমার কাছে এসেছি, ঠিক সেদিনও আবার আমাদের এই ভাবেই আসতে হবে তোমার কাছে পরামর্শ নিতে। যাই হোক, থাক সেসব কথা।

বন্ধু, এসব কথা শুনে আমার মনটাও দুই তিন বার তালে বেতালে নড়েচড়ে উঠল। সময় নষ্ট না করে দেবতাদের প্রতিশ্রুতি দিয়ে স্বর্গে পাঠিয়ে দিলাম। বাকি রাত নর্তকীদের সঙ্গো নাচে, গানে মশগুল ছিলাম। সকাল হলে নর্তকীরা ফিরে গেল। আর আমিও নিজেকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। এমন সুন্দর গানের গলা হয়েছে আমার আর সেই সাথে নাচের ছন্দ। অপূর্ব! অমায়িক! অসাধারণ!

তুমি যত তাড়াতাড়ি পারো আমার কাছে চলে এসো। আমার আবাস জানো তো। কাঠু (কাঠবিড়ালি) লম্ফ ঝম্প, প্রযত্নে— কেওড়া গাছ, গ্রাম— বৃক্ষতলা, ডাকঘর— খাটিয়ারতলা, জেলা— জঙ্গালমহল।

আর দেরি করো না। পত্রপাঠ চলে এসো। জানো তো? এই মন্ত্রিত্ব একা একা ভালো লাগে না। আরো কিছু সাঙ্গা-পাঙ্গা না থাকলে ঠিক মানায় না। যতই হোক দলটা একটু ভারী হওয়া চাই। কি বলো! যত লোকজন থাকবে, যত সাঙ্গা-পাঙ্গা আশেপাশে ঘোরাঘুরি করবে ততই তো সবাই বলবে— হেভি ওয়েট নেতা, হেবি ওয়েট নেতা। তাই তোমাকে তো চাই-ই, আরো যদি তোমার মতো থাকে তো অনেককেই ধরে বেঁধে নিয়ে চলে এসো। তারপর দেখছি কি করা যায়।

আরো অনেক কথা আছে। যা চিঠিতে লেখা যায় না, গোপনে বলতে হয়। তুমি তো এসো, তারপর দেখবে আমার সাথে সাথে তোমারও পিলে চমকে যাবে, সব দেখে। আর কিছু লিখছি না।

তোমার আগমনের অপেক্ষায়—
কাঠু (কাঠবিড়ালি)

———

ডিজেদেব মাহাত্ম্যকথা

অমিয় আদক

নাদব্রহ্ম অন্বেষণের চেষ্টা করি না। তবুও সন্ধান পাই নাদব্রহ্মের। আপনারা আমায় সাধক ভাবতে বসবেন না। একবিংশ শতকের বাস্তব নাদব্রহ্ম হলেন ডিজেদেব। তাঁর মাহাত্ম্যকথাই আপনাদের জানাতে চাই। জানা দরকার, সেই দেবতার কাছ থেকে আমরা কি কি করুণা পাই। তাই মানুষের প্রতি তাঁর করুণার লিস্টিটা রাখার চেষ্টা মাত্র। আমি তাঁর করুণা-অমৃতের কিছু সন্ধান পেয়েছি। সেগুলিই আপনাদের জানাই। অতিরিক্ত কিছু জানা থাকলে অধমকে জানাতে ভুলবেন না।

ডিজেদেবের বক্সগুলোর আওয়াজ অনেক দূর পৌঁছায়। অনেক মানুষ শুনতে পান। তাই, ঘরে বাইরে লুকিয়ে চুরিয়ে কোমর নাচানোর চেষ্টা করতে পারেন। তাতে শরীর চর্চা করার সুযোগ বাড়ে। সেই নাচের জন্য শরীরের মেদ কমে। বেশ কিছু ক্ষেত্রে প্রকাশ্য স্থানে সম্মিলিত নাচের ভিডিও তৈরির সুযোগ বাড়ে। সেগুলি সোস্যাল মিডিয়ায় পোস্টিত হয় অসীম উৎসাহে। আবার সে পোস্ট ভাইরাল হতেও দেখা যায়। আরও কত্তো কীই ঘটতে পারে! আপনাদের সবটা বুঝিয়ে বলতে পারছি না। সেসব অনেক কাণ্ড। অনেক ব্যাপার!

তারসাথে একটা কথা মনে রাখুন। খালিপেটে নাচ হয় না। ভালো খাবার পেটে পড়তে হবে। প্রয়োজনে উত্তেজক তরল গলায় ঢালতে হয়। বর্তমানে তা অলিগলিতে সহজলভ্য। তবেই তো জমাটি নাচ সম্ভব। অতি জমাটি নাচ ছাড়া ডিজেদেব মূল্যহীন। আবার ডিজেদেব ছাড়া জমাটি নাচ হতেই পারে না। এ এক বিস্ময়কর মেলবন্ধন ডিজেদেব এবং কসরতি নাচের। এর মাঝে একটা কথা। ডিজেদেবের আওয়াজ ও মাঝের একচিলতে গান কাছের মানুষ ভোঁধরা কানে হাড়েহাড়ে বুঝতে পারেন। দূরের মানুষ কেবল ড্রামের তাল এবং ভোঁদা গিটারের গোঁগাঁগুলোই শুনতে পান।

ডিজেদেবের করুণার কথা, বলে শেষ করা যায় না। সব লিখলে মিনি মহাভারত। তাঁর জোরালো আওয়াজ বিষয়ে ডাক্তারবাবুরা সম্ভবত ভুল কথা বলেন। যে মানুষ কানে প্রায় কালা, তিনিও ডিজেদেবের আওয়াজ ভালোই অনুভব করেন। তিনি কানে না শুনলেও, বুকে শব্দের মোক্ষম ধাক্কার ওঠাপড়া হাড়েমজ্জায় টের পান। বধির ব্যক্তি ডিজেদেবের করুণায় শোনার অনুভূতি পান। তাই ডিজেদেবকে 'বধির বন্ধু' আখ্যা দেওয়াই যুক্তি সঙ্গত।

তারসাথে এটাও অস্বীকার করার উপায় নেই, বেশি সময় ধরে ডিজেদেবের বেশি প্রাবল্যের আওয়াজ সুস্থ শ্রবণ শক্তির দফারফা করতে বেশি সময় নেয় না। তখন অবশ্য একটা বিষয়ে সুবিধা মেলে। কেউ কটুকথা বললেও কানে

ঢোকে না। জানেন, বোবা কালার শত্রু নেই। তাই অজাতশত্রু হিসাবে না জন্মালেও ডিজেদেবতার শব্দবাণ আপনাকে শত্রু শূন্য বানিয়ে দেবে। এই মন্তব্য বেশ জোরের সাথেই করা যায়।

বয়স্ক লোকদের কাছে ডিজেদেব পরম সুহৃদ স্বরূপ। তাঁর শব্দের আবহে থাকার সময় বয়স্কদের হৃদযন্ত্রের উপর একটু ধাক্কা লাগার কারণে হৃদস্পন্দন দ্রুততর হতেই পারে। তাতে তাঁর হৃদযন্ত্রের কার্যকারিতা বাড়ে। কার্যকারিতা বাড়ার ফলে হৃদযন্ত্রের কাজ আকস্মিক বন্ধ হলেও অবাক হবেন না। অবাক হবেন না, তিনি অক্কা পেলেও। কারণ সেই ব্যক্তির সত্বর স্বর্গলাভের কাজটা ডিজেদেবই ত্বরান্বিত করেন। তাই ডিজেদেব সাউন্ডের এখানে ধন্যবাদ পাওয়াই যুক্তিযুক্ত। কারণ সামাজিক জঞ্জাল এই বুড়োগুলোকে তাঁর মহান শব্দের চোটের করুণায় তাড়াতাড়ি পঞ্চত্ব প্রাপ্তির দিকে আগিয়ে দেয়। তাই বলি, ডিজেদেব তুমি জিও। তোমার অনুরাগীরা বলবেন, 'নাচো গাও, ঢুকটুক পিও'।

তার সাথে ভাবুন, বয়স্ক ব্যক্তির অযথা আয়ু বাড়ার প্রয়োজন নেই। তিনি পেনসনার হলে তাঁর মৃত্যুতে সরকারের অথবা পূর্ব নিয়োগ কর্তার খরচ কমবে। জনগনের ট্যাক্সের টাকায় অথবা নামকরা কোম্পানির টাকায় বুড়োবুড়িগুলো বেকার প্রতিপালিত। সরকারের অর্থবিভাগের এবং নামকরা কোম্পানিদের এই সমস্ত ক্ষেত্রে ডিজেদেবের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য উৎসাহ দেওয়া প্রয়োজন। তারসাথে ডিজেদেবের প্রতিমা এবং অন্যান্য অনুষঙ্গা ক্রয়কারি ব্যক্তিকে ধার্য্য দামের উপর বিশেষ সাবসিডি দেওয়াও আশু প্রয়োজন। নইলে ডিজেদেব প্রতিমার সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটানো অসম্ভব।

যিনি পেনসন পান না। বেশি বয়সে নিজস্ব আয়ের সংস্থান নেই। বয়স্ক, দুর্বল, অক্ষম ব্যক্তিটি সামান্য উপার্জন সক্ষমও নন। পরিবারের অন্ন এবং অর্থ ধ্বংসকরাই তাঁর একমাত্র কাজ। সাথে মাসে এ রোগ সে রোগের ওষুধের জন্য মাসিক খরচটাও বেশ বড়ো মাপের। ডাক্তারবাবুদের ফিজের চড়া দাম। সেই চড়াদামের ফিজ গোনাটাও কমে। কমে ডায়াগনাস্টিক ল্যাবের বিভিন্ন পরীক্ষার খরচ। তাই বলা যায়, সেই পরিবার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ডিজেদেব দ্বারা উপকৃত। তাই সেই পরিবারও আনন্দের আতিশয্যে বলতেই পারে, 'ডিজেদেব যুগযুগ জিও, বুড়োবুড়িগুলোকে তাড়াতাড়ি নিও।'

ডিজেদেবের মহিমা অপার। বিশেষভাবে মা কালীর পুজোর রাতে। সন্ধ্যা থেকে উচ্চগ্রামে শব্দ উৎক্ষেপণের বিরতি মেলে না। তিনি অবশ্য তার জন্য ক্লান্তি অনুভব করে না। এলাকার মানুষের সেই রাতের ঘুম চৌপাট। ঘুম চৌপাটে সুবিধেও আছে। নবীন দম্পতি সারারাত জাগার সুযোগ পান। তাঁদের সারারাত ধরে প্রেমের অথবা খুনসুটির খতিয়ান লম্বা হওয়ার সুযোগ পায়। পরের প্রভাতে দেরিতে উঠলেও কৈফিয়তের ভাবনা থাকে না। ডিজেদেবের উপরে সমস্ত দায় চাপানো যায়। তাই তিনি তাঁদের অপ্রত্যক্ষ বন্ধু হয়েই তাদের ঘুম

কামাইয়ের দায় নেন। তাঁরা মনেমনে বলেন, 'ডিজেদেবের এমন শৌখিন উৎপাত থাকুক। ডিজেদেব যুগযুগ জিও।'

এদিকে অন্যেরা জানালা দরজা বন্ধ করেও শব্দের প্রাবল্য থেকে রেহাই পান না। সারারাত জেগে বিছানায় জাগেন। এপাশ সেপাশ গড়িয়েও চোখের পাতায় ঘুম নামার লক্ষণ মেলে না। বিরক্তিতে মনেমনে কিছু কটুবাক্য ডিজেদেবের প্রতি নিক্ষিপ্ত হতেই পারে। ডিজেদেবের মহানাদের জন্য মহাভক্তদের কিছুই যায় আসে না। তাঁদের উৎকট আনন্দে শেষ রাতেই জোয়ার আসে বেশি। এমন উৎকট আনন্দদায়ক দেবতা বেঁচে থাকার দরকার আছে। ডিজেদেবের কল্যাণে সমাজের উপকারের সীমা নেই। যে এলাকায় তিনি নাদ সৃষ্টি করেন, সেখানে ছিঁচকে চোরেরা বেশ অসুবিধায় পড়েন। মানুষের চোখে ঘুম না থাকার কারণে ছিঁচকে চোরেদের সর্বনাশ, গৃহস্থের পরোক্ষে পৌষমাস। এখনের পরিবারগুলির পক্ষে ডিজেনাদ অতি হিতকর বাদ্য। তাই আবার সগর্বে ঘোষণা করি, 'ডিজেদের যুগযুগ জিও।'

ডিজেদেবের ব্যবহার বর্তমান সমাজের অনেকের বিচারে বেশ আনন্দ অর্থাৎ আমোদ-দায়ক। ছোটখাটো, মাঝারি, বড়ো সব ধরনের বারোয়ারি কিংবা পাড়ার পুজোতে এবং পুজোর প্রাক্কালে ব্যাপক ব্যবহার সমাজের প্রচুর উপকার সাধন করে। বারোয়ারি পুজোর দিনে বাঁকে কিংবা কাঁখে ঘটি কিংবা কলসি নিয়ে তাঁর অনুরাগী কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতীদের গঙ্গাজল কিংবা স্থানীয় নদীর জল আনয়নের মিছিল বেরোয়। সেই মিছিলের আগেপিছে তাঁর একাধিক অবতার। শুধু তাঁর শব্দদানব সৃজনকারি বক্সগুলো ইঞ্জিনভ্যানের উপর ছোট টিলার আকার ধারণ করে। সেটির শক্তি যোগানের জন্য থাকে ঢাউস জেনারেটর সেট। সেই মিছিল সংগঠিত করার ঘন্টা খানেক আগে থেকেই শব্দদানবের উৎপাত শুরু।

সেই সময় চলে দেবতার সাথে তাঁর অনুরাগীদের সেলফির হুড়োহুড়ি। সম্ভবত ডিজেদেবীও কেউ কেউ কল্পনা করেন। সেই সুন্দরী দেবীকে প্রেমিকা জ্ঞানে কিশোর-যুবকরা সেলফি তুলতে থাকে। অপর পক্ষে তাঁকে প্রেমিক জ্ঞানে কিশোরি-যুবতীদের সেলফি সেসন চলতেই থাকে। এমন মধুর দৃশ্য দেখে সত্যিই চোখ জুড়িয়ে যায়। পৃথিবীর অন্য কোথাও এমন বিরল দৃশ্য কেউ দেখে থাকলে আমায় জানাবেন। তরুণদের একত্রিত করার এমন বাস্তব দেবতাকে অস্বীকার করার উপায় নেই। আমাদের ধর্মীয় বিনোদন সংস্কৃতির উন্নতি বা অবনতি নিয়ে দয়া করে কেউ ফ্যাঁকড়া তুলবেন না। দোহাই আপনাদের।

সাধারণত মিছিল শুরুর জায়গা হিসাবে স্থানীয় বাজার এলাকাকেই স্থির করেন উৎসাহীরা। সেই মিছিল অতি ধীরে নাচন কোঁদন করতে করতে স্বস্থানে পৌঁছানোর জন্য আগায়। তখন বাজার এলাকায় যানজট স্বাভাবিক। করুণ, অতিষ্ট অবস্থা। প্রশাসন সেখানে একান্তই নীরব। আবার বিশেষ নেতাদের অঙ্গুলি হেলনে সিভিক পুলিশ ভাইরা এবং পুলিশ দাদারা সেই উশৃঙ্খল

মিছিলকে পথ করে দেওয়ার জন্য সাধারণ মানুষদেরই হেনস্থা করেন। এবার বুঝুন প্রশাসন প্রকারান্তরে এই অদ্ভুত উশৃঙ্খলাকে কি সুন্দর প্রশ্রয় দেয়! কি বিস্তর সমীহের চোখে দেখে! সেই অবাঞ্ছিত মিছিলের ব্যক্তিরা যেন ভিআইপি।

অনুরূপ মিছিল পুজোর জন্য দেব কিংবা দেবীর মূর্তি আনয়নেও দেখা যায়। বিসর্জনেও তেমন মিছিল। তার জনশক্তি আরও অনেক বেশি। সেই জনজোয়ারের শৃঙ্খলা রক্ষায় কাউকেই নজরে আসে না। সেই মিছিলে মাতাল, পাঁড়-মাতালের সংখ্যা ভালোই। তাই শৃঙ্খলা রক্ষাকারীরা ভয়েই গা আড়াল দিতে বাধ্য থাকেন।

আরও আনন্দের কথাগুলো জেনে রাখুন। ডিজেদেবের মাত্রাতিরিক্ত শব্দ দূষণ বিষয়ে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে জানাতে গেলে, কোন কোন কর্তা খানিক তাচ্ছিল্লের সাথেই বলেন, দূর মশাই, এসব নিয়ে কেউ বলতে আসে? যুগের সাথে তাল মেলান। নইলে আপনাকে কেউ পাত্তাই দেবে না। সবই তো বোঝেন। এখনের ভুঁইফোড় নেতারাই সব। তাদের সাথেই না হয় তাল মেলাবেন। একান্ত বিনীত ভাবেই জানাই, 'এই বয়সে তা আর সম্ভব নয়।' তিনি আমাকে কোনভাবে বিদায় করতে পারলেই বাঁচেন। আমাদের মতো অসহায় ব্যক্তিরা নীরবেই সেই অফিস থেকে বেরিয়ে আসতে বাধ্য থাকেন। এই তো আমাদের হাল হকিকৎ!

তাই এই অসীমগুণের অধিকারী ডিজেদেবের প্রশস্তি সূচক ছড়াটা আপনাদের জন্যই দিলাম।

নাদব্রহ্ম তুমি কিনা বুঝিতে না পারি।
অধম অক্ষমে তুমি দাও ক্ষমা করি।
ডিজেদেব নাদেশ্বর কিংবা নাদেশ্বরী
তোমার চরণে আমি দণ্ডবৎ করি।
দামামা, তুরি বা ভেরি কাড়া ও নাকাড়া
শব্দ প্রাবল্যে তুমি শতগুণ বাড়া।
তোমার উৎপাতে হয় ঝালাপালা কান।
তবুও এ পোড়া বঙ্গে তুমি মূল্যবান।
তোমার গুণের কথা অসীম অপার।
তুমি করো সমাজের বহু উপকার।
তোমার মাহাত্ম্য কথা অমৃত সমান।
এক মনে শুনে যারা মহা পূণ্যবান ।
স্বর্গের সমান সুখ পারো তুমি দিতে।
তুমিই অমর থাকো এ বঙ্গের হিতে।

---

১ নং মির্জাপুর নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়

বেলডাঙ্গা চক্র, মুর্শিদাবাদ

নির্মল বিদ্যালয় পুরস্কার পাচ্ছে মির্জাপুর নিম্নবুনিয়াদি বিদ্যালয়

মির্জাপুরের নিম্নবুনিয়াদি বিদ্যালয় যেন একটুকরো মরুদ্যান

Edited, Printed & Published by Dinanath Mondal (M-9153126613)
from Mirzapur, Beldanga, Dist- Murshidabad (W.B), India